পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬১ বর্ষ ॥ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

৩০ তাবূক ১৩৭৭ হিঃ শাঃ ❑ ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ ঈসাব্দ

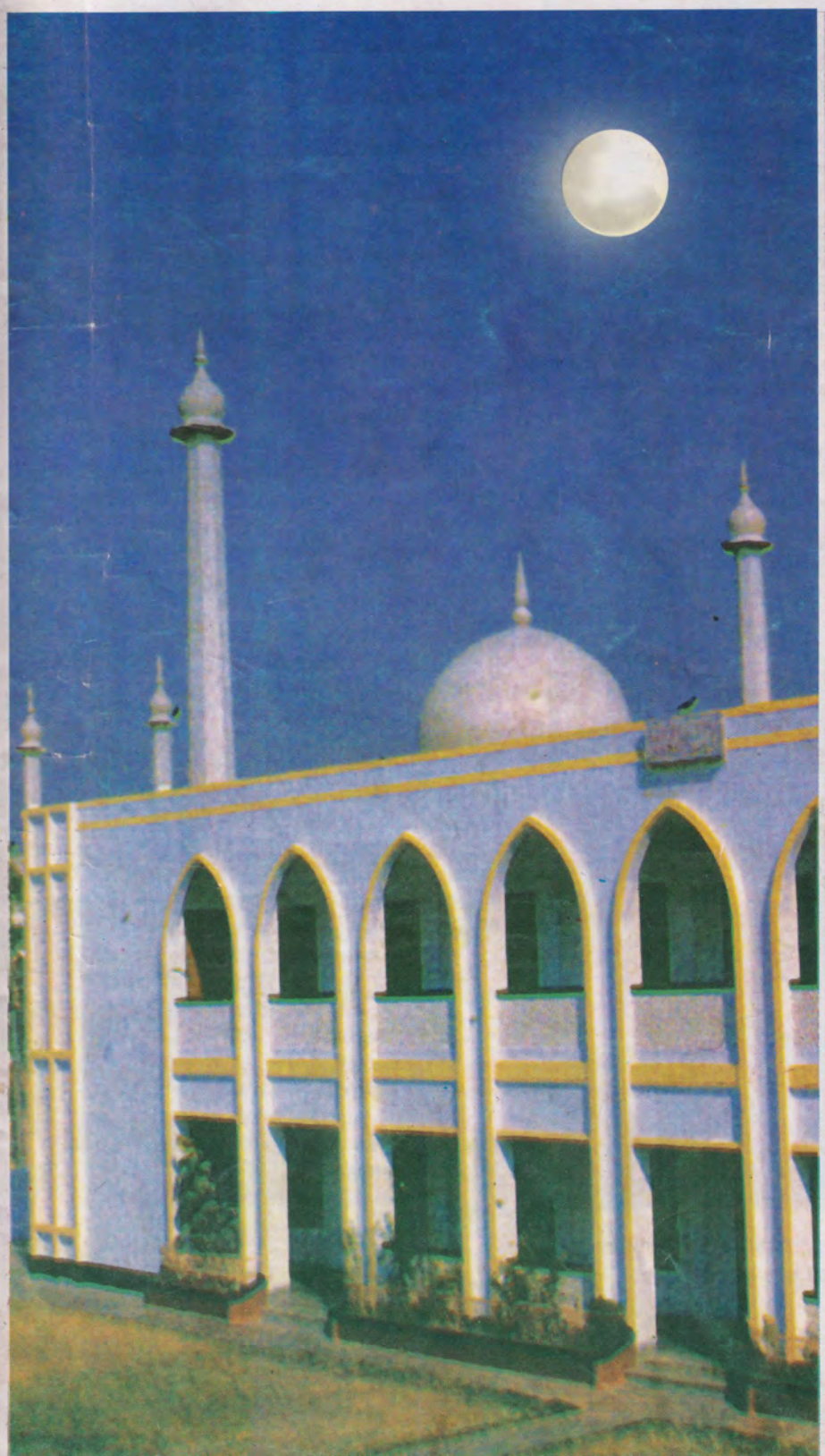

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম ও ৪র্থ খলীফা ***হযরত মির্যা তাহের আহমদ*** *(আইঃ) বাংলাদেশের শতাব্দী কালের সকল রেকর্ড ভঙ্গকারী মহাপ্লাবনে জান ও মালের ক্ষয়-ক্ষতিতে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন ও* ***বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এক লক্ষ মার্কিন ডলার অনুদান প্রদান করেন।*** *গত ২৯শে সেপ্টেম্বর খলীফা সাহেবের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর নিকট উক্ত এক লক্ষ ডলারের ব্যাংক ড্রাফটটি হস্তান্তর করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী। তাঁর সাথে ছিলেন প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, সেক্রেটারী তবলীগ মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন ও সদর মুরব্বী মওলানা আবদুল আওয়াল খান চৌধুরী।*

এছাড়াও আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে নগদ অর্থ, খাদ্যসামগ্রী ও ওষুধপত্র বিতরণ করেছে। উল্লেখ্য, পর পর কয়েক সপ্তাহ বন্যার্তদের মাঝে তৈরী খাবারও বিতরণ করা হয়েছে।

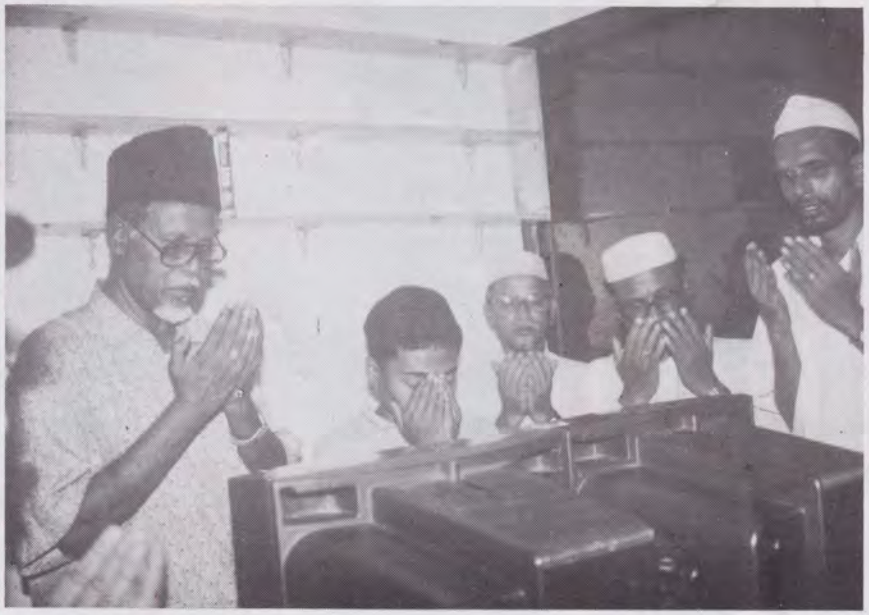

গত ২৮.০৯.৯৮ তারিখ সন্ধ্যায় MTA বাংলাদেশের দ্বিতীয় EDIT PANEL আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। সংক্ষিপ্ত এই অনুষ্ঠানে জনাব ন্যাশনাল আমীর সাহেব উদ্বোধনী দোয়া পরিচালনা করেন।

মানব সেবায় এগিয়ে আসুন

সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশের ওপর দিয়ে যে, মহা প্লাবন বয়ে গেলো এর ক্ষয়-ক্ষতি সম্বন্ধে সকলে অবহিত ও সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এলাহী জামাত হিসাবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেশী। মা যেমন তার দুষ্ট ছেলেকে শাসন করার পরে নিজেই আবার কাঁদতে বসেন, তেমনি মাতৃসম অবস্থা হলো এলাহী জামাতের। প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকে না মানার কারণে এবং তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে সাথে সাথে ঐশী জামাতের ওপরে অন্যায়ভাবে যুলুম অত্যাচার করার কারণে ঐশী গযব নেমে আসলে এলাহী জামাত তাতে আনন্দিত হতে পারে না বরং মানবের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তাদের প্রাণ কেঁদে উঠে। তখন সাহায্যের হাত প্রসারিত করে। আমাদের অবস্থা হয়েছে তদ্রূপ। আমরা যদিও ক্ষুদ্র জামাত কিন্তু আমাদের খোদা গনী এবং পরম শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী। আমরা মানব-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে একদিকে যেমন তাদের অধ্যাত্মিক মুক্তির জন্যে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজ করে যাবো অন্য দিকে আমাদের যা শক্তি ও সামর্থ্য আছে তদ্বারা দুঃখী মানবের পাশে দাঁড়াতে পারলেই আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি বলে খোদার নিকট গৃহীত হবো। সুতরাং বাংলাদেশের আহমদী ভাইদেরকে যার যতটুকু সাধ্য ও সামর্থ্য আছে তদনুযায়ী জামাতের রিলিফ ফান্ডে অংশ নিবেন। এ পর্যন্ত আমরা আমাদের সাধ্যমত ত্রাণ কার্যে অংশ নিয়েছি। আমাদের প্রিয় খলীফা হযরত মির্যা তাহের সাহেব (আইঃ) প্রধান মন্ত্রীর ত্রাণ-তহবিলে একলক্ষ ইউ.এস. ডলার (প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা) অনুদান প্রদান করেন। গত ২৯-৯-৯৮ তারিখে উক্ত অনুদানের চেক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর হাতে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। ইন্টার্নেট মারফত জানা গেছে যে, আমাদের কানাডা জামাত সেখানকার বাংলাদেশী হাইকমিশনের নিকট সহানুভূতি প্রকাশ সহ ২,০০০ (দুই হাজার) ডলার তাৎক্ষণিক অনুদান হস্তান্তর করেছেন। আরও সংগ্রহ করার চেষ্টা করছেন। আমরা আশা করি বিশ্বের অন্যান্য দেশের জামাত থেকেও এ ধরনের সাহায্য আসতে থাকবে।

তাহরীকে জাদীদের চাঁদার বর্তমান বছর আগামী ৩১শে অক্টোবর শেষ হতে যাচ্ছে। সুতরাং স্থানীয় জামাতকে আগামী মাসের প্রথম দিকে আশারা পালন করে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় করে ২০-১০-৯৮ তারিখের মধ্যে কেন্দ্র পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে যেন পূর্ণ ওয়াদাকৃত চাঁদা আদায়কারীদের তালিকা হুযূর (আইঃ)-এর খেদমতে বিশেষ দোয়ার জন্য ২৫-১০-৯৮ তারিখের মধ্যে পেশ করা যায়। তাছাড়া হুযূর (আইঃ) কর্তৃক এর নববর্ষের ঘোষণা হলে সত্বর যাতে ওয়াদার তালিকা প্রণয়ন করে কেন্দ্রে পাঠানো যায় সে লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬১ বর্ষ ॥ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

১৫ আশ্বিন ১৪০৫ বঙ্গাব্দ ❑ ৮ জমাদিউস সানী ১৪১৯ হিঃ কাঃ
৩০ তাবূক ১৩৭৭ হিঃ শাঃ ❑ ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

সম্পাদক
মকবুল আহমদ খান

সহকারী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহ উদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মদ শামসুর রহমান

সহকারী হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ, কে, রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	-	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
জাভেদ এ, মতিন	-	ক্যালিফর্নিয়া
আব্দুর রব	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ	-	জাপান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	-	হংকং
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৩৪১৪

সম্পাদকীয়

মাসিক মদীনার মিথ্যাচার!

কারো সম্বন্ধে কোন উক্তি করলে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া উচিত– এটাই ভদ্রতা এবং আইনানুগ নীতি। মাসিক মদীনা বা এ ধরনের কতিপয় পত্রিকা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে এক তরফাভাবে মিথ্যাচার করে যান অথচ এ ব্যাপারে আমরা অনেক সময় জানতেও পারি না। তাদের উচিত আমাদের নিকট পত্রিকার কপি পাঠানো যাতে করে আমরা আমাদের বক্তব্যও জন সমক্ষে তুলে ধরতে পারি।

মাসিক মদীনা সেপ্টেম্বর '৯৮ সংখ্যায় আমাদের সম্বন্ধে মিথ্যা বক্তব্য রেখেছে। ঘটনাক্রমে ইহা আমাদের গোচরীভূত হয়েছে। তাই এগুলোর জবাব দেয়ার নৈতিক প্রয়োজন মনে করছি।

প্রশ্নোত্তর বিভাগে জনৈক মিজানুর রহমানের প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে, "পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ ছেটে ফেলা হয়েছে! এ অপপ্রচারটি কাদিয়ানী ও শিয়াদের একটা জঘন্য অপপ্রচার মাত্র"।

শিয়ারা এ অপপ্রচারটি করে কিনা তা আমাদের জানা নেই তবে আমরা এ অপপ্রচার করি না। আমাদের আকিদা ও ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের বই-পুস্তকে এন্তার বলা আছে। খাতামান্নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ওপরে যে কুরআন শরীফ নাযেল হয়েছে তা-ই আমাদের কুরআন ; তাথেকে এক বিন্দু বেশীও নয় এক বিন্দু কমও নয়। সুতরাং আমরা প্রশ্নকারীর কথায়ই বলছি– আমাদের বিরুদ্ধে 'একথাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন একটি অপপ্রচার ছাড়া আর কিছু নয়।'

অন্য আর এক স্থানে জনৈক এ. এইচ. এ. শাহীনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে উত্তরদাতা বলেছেন– "ঈসা (আঃ)-কে শূলীবিদ্ধ করে মেরে ফেলা হয়েছে– কেউ একথা বললে কাফের হয়ে যাবে। আমাদের দেশে মুসলমানের ছদ্মবেশধারী কাদিয়ানী মুরতাদেরা এ ধরনের বিভ্রান্তিকর কথা বলে থাকে। কোন মুসলমান বলে না।"

আমরা উত্তরদাতাকে সর্বশক্তিমান খোদার কসম দিয়ে বলছি, আপনি কি আমাদের কোন বই-পুস্তক থেকে দেখাতে পারবেন যে, আমরা এই আকীদা ও ধর্ম-বিশ্বাস পোষণ করি? যেখানে আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন করীমে-ওয়ামা কাতালুহু ইয়াক্বীনান (অর্থ: এবং নিশ্চিতরূপে, তারা তাকে হত্যা করেনি' –৪ ঃ ১৫৮) বলেছেন, সেখানে আমরা কি করে বলতে পারি যে, ঈসা (আঃ)-কে শূলীবিদ্ধ করে মেরে ফেলা হয়েছে? শত আফসোস! আমরা লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন– মিথ্যাবাদীদের ওপরে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হোক পাঠ করছি। সৎসাহস থাকলে মাসিক মদীনার উত্তরদাতাকেও এ লা'নতের দোয়া পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

মাসিক মদীনার উল্লেখিত সংখ্যায়ই জনৈক মোল্লা জামান রচিত 'কাদিয়ানী মতবাদ একটি ফেৎনা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে। যথাসময়ে এর জবাব দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ্‌। আপাততঃ এতটুকু বলে রাখি– মোল্লা জামান সাহেব আমাদের প্রকাশিত আহ্‌বান পুস্তকের নিম্নোক্ত অংশ তুলে ধরেছেন :

"ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে খোদাতাআলা তোমাদের নিকট ইহা চাহেন যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্‌ এক-অদ্বিতীয় এবং মুহম্মদ (সঃ) তাঁহার নবী এবং খাতামাল আম্বিয়া (নবীদিগের মহর)। তিনি সকল নবী হইতে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার পরে তাঁহার গুণে গুণান্বিত হইয়া, তাঁহার প্রতিচ্ছায়ারূপে যিনি আসেন তিনি ব্যতীত অন্য কোন নবী আসিবেন না"।

এর ওপরে মন্তব্য করতে গিয়ে মোল্লা সাহেব মন্তব্য করেছেন– "উপরের আকিদাটুকুই একজন মানুষের কাফের হবার জন্যে যথেষ্ট"।

মোল্লা সাহেবকে আমাদের জিজ্ঞাস্য :

উক্ত উদ্ধৃতিতে আল্লাহ্‌ এবং মুহাম্মদ (সঃ) সম্বন্ধে আমাদের যে আকিদা বর্ণনা করা হয়েছে তা-ও কি আপনার মতে কাফের হওয়ার জন্যে যথেষ্ট? আপনার মন্তব্য থেকে যদি কেউ ইহা বুঝে তাহলে তাকে দোষারোপ করবেন কোন বিবেকে?

(অবশিষ্টাংশ সূচীর নীচে দ্রষ্টব্য)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মজীদ (তফসীর সহ)	ঃ 'কুরআন মজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস শরীফ ঃ হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা– মাওলানা সালেহ আহমদ	৪
❑ অমৃত বাণী ঃ আল্লাহ্‌র পথে ত্যাগ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ– আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	৪
❑ ইউ. কে. সালানা জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ– মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫-৭
❑ হোমিওপ্যাথি– সদৃশ বিধান চিকিৎসা মূল : হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)	ঃ অনুবাদ– মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	৮-৯
❑ হাকীকাতুল ওহীঃ মূল–হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ– জনাব নাজীর আহমদ ভূঁইয়া	১০-১২
❑ ইনকিলাবে হাকীকী (প্রকৃত বিপ্লব) মূল– হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ সানী, আল মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ)	ঃ অনুবাদ– জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১২
❑ খতমে নবুওয়ত ও আহমদীয়া জামাত মূল– আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নযীর লায়েলপুরী	ঃ অনুবাদ– এ. এইচ. এম. আলী আনোয়ার (মরহুম)	১৩-১৪
❑ জুমুআর খুতবাঃ আমানতের সংরক্ষণ হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ– মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	১৫-২০
❑ উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২১-২২
❑ বাইবেলের শিক্ষা ও খৃষ্টানদের বিশ্বাস	ঃ সংগ্রহ ও অনুবাদ– জনাব খন্দকার আজমল হক	২২-২৩
❑ ছোটদের পাতাঃ ওয়াকেয়াতে শীরী মূল : জনাব মির্যা খলীল আহমদ কমর	ঃ পরিচালক– জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৪
❑ শেষ যুগের প্রতিশ্রুত ঐশী জামাত– আহমদী জামাত	ঃ অনুবাদ– সাহেবুল কাহ্‌ফ	২৫-২৭
❑ প্রাসঙ্গিক আলোচনা	ঃ মৌলবী হাফেয মোহাম্মদ সেকান্দর আলী	২৮-২৯
❑ নারীর মর্যাদা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ– জনাব নাজীর আহমদ ভূঁইয়া	৩০-৩৩
❑ তাহরীকে জাদীদের মোতালেবাত (দাবীসমূহ)	ঃ সংগ্রহ ও অনুবাদ– মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৩৪-৩৫
❑ কবিতা ঃ বন্যায় কান্না	ঃ জনাব ফজলে-ই-ইলাহী	৩৫
❑ শান্তিপ্রিয় দেশাবাসীর নিকট আবেদন	ঃ আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক	৩৬-৩৮
❑ সংবাদ	ঃ	৩৯-৪০

প্রচ্ছদ : কাদিয়ানের মিনারাতুল মসীহ ও ঢাকাস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় মসজিদ ও কমপ্লেক্স।

সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ

এতদ্ব্যতিরেকে মোল্লা সাহেব নবুওয়তের মসলা নিয়ে আহমদীদেরকে অবলীলায় কাফের বলে ফেল্লেন– আমরা তো জানি এ ধরনের আকিদা পোষণ করতেন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) সহ আরও অনেক সর্বজনমান্য বুযর্গ [দেখুন তকমেলা মাজমাউল বেহার, দুররে মানসূর, ফতুহাতে মক্কীয়া, আল ইউয়াকিতুআল জওয়াহের, নাবরাস, আল্ ইনসানুল কামেল, মসনবী রূমী, তফহীমাতে ইলাহিয়া, তাহযীরূন নাস প্রভৃতি] এসব মহান গ্রন্থের প্রণেতাগণের ব্যাপারে মোল্লা সাহেব কী ফতওয়া দিবেন? আর এটুকু আকিদার জন্যে যদি আমরা কাফের (?) হয়েই থাকি তাহলে আবার সভা-মহাসম্মেলন প্রভৃতি করে সরকারের দোরগোড়ায় ধন্না দেয়া কেন?

আসল কথা কি জানেন, আপনারা কুরআন ও রসূল (সঃ)-এর শিক্ষাকে উপেক্ষা করে বনী ইসরাঈলী নবী হযরত ঈসা (আঃ)-কে চতুর্থ আসমানে উঠিয়ে রেখে যত গোল বাঁধিয়েছেন। অবশ্য আপনারাই বলেন যে, হযরত ঈসা নবীউল্লাহ্ আবার দুনিয়াতে আসবেন (একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। কেননা, মুসলিম শরীফের হাদীসে নবী করীম (সঃ) আগমনকারী ঈসাকে চার বার 'নবীউল্লাহ্ ঈসা' বলে আখ্যায়িত করেছেন)। ঐ আকিদা-বিশ্বাস কি আপনার মতে খতমে নবুওয়তের খেলাফ নয়? উহা কি কুফরীর পর্যায়ে পড়ে না?

মোল্লা সাহেবের নিকট বিনীত অনুরোধ, আপনি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও বুযর্গানের অভিমত অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত নিন তাহলেই আমাদের আকিদার সব বিষয় আপনার নিকট বোধগম্য হবে। ঈসা (আঃ)-কে আকাশে বসিয়ে রেখে কোন বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান হবে না। অবশ্য ঈসা (আঃ) যে মারা গেছেন তা মাসিক মদীনাও স্বীকার করেছে বৈকি, আমরা বল্লেই যত দোষ। মাসিক মদীনার এপ্রিল, ১৯৯৪ সংখ্যায় সর্বজনাব নজমুল হুদা সিরাজী ও মুহাম্মদ সফিউল্লাহ্ লিখিত 'প্রচলিত খ্রীষ্ট ধর্মের স্থপতি কে?' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন– "...কিন্তু গভীর অনুসন্ধান ও বিচার-বিশ্লেষণে একথা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, যীশু যে জীবন বিধান ও জীবন দর্শন শিক্ষা দিয়েছিলেন সে শিক্ষা তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে যায়" (পৃষ্ঠা-৯)। সুতরাং মাসিক মদীনা যে ঈসা (আঃ) বা যীশু খ্রীষ্টকে মৃত মনে করেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা সকলের সঠিক পথ প্রাপ্তির জন্যে কায়মনোবাক্যে দোয়া করছি।

কুরআন মজীদ

সূরা আল্ মায়েদা–৫

৪৪। এবং তাহারা কীরূপে তোমাকে (তাহাদের) বিচারক নিযুক্ত করিবে, যখন তাহাদের নিকট তওরাত আছে, যাহাতে আল্লাহ্‌র আদেশাবলী মজুদ রহিয়াছে?[৭৪৮] ইহা সত্ত্বেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়; এবং তাহারা আদৌ মু'মিন নহে। *(৬ষ্ঠ রুকূ)*

৪৫। নিশ্চয় আমরা তওরাত নাযেল করিয়াছিলাম–উহাতে হেদায়াত এবং নূর ছিল, ইহা দ্বারা নবীগণ যাহারা আত্মসমর্পণকারী ছিল, এবং তত্ত্ব-জ্ঞানী পুরুষগণ[৭৪৯] এবং ইহুদী পণ্ডিতগণ[৭৫০] ইহুদীদের জন্য ফয়সালা করিত, যেহেতু তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র কিতাবের হিফাযতের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহারা উহার তত্ত্বাবধায়ক ছিল। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করিও না, বরং আমাকে ভয় কর আর আমার আয়াতসমূহ স্বল্প-মূল্যে বিক্রয় করিও না। এবং আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা ফয়সালা করে না, বস্তুতঃ তাহারাই কাফের।

৪৬। এবং আমরা উহাতে তাহাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছিলাম, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং (অন্যান্য) জখমের সমান সমান বদলা।[৭৫১] অতঃপর যে-ব্যক্তি দাবী প্রত্যাহার করে, সেক্ষেত্রে ইহা তাহার জন্য কাফ্‌ফারা (পাপ মুক্তির উপায়) হইবে এবং আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা ফয়সালা করে না, প্রকৃতপক্ষে তাহারাই যালেম।

৪৭। এবং আমরা মরিয়মের পুত্র ঈসাকে তাহার পূর্ববর্তী তওরাতে যাহা ছিল উহার সত্যায়নকারী করিয়া তাহাদের (পূর্ববর্তী নবীগণের) পদাঙ্ক অনুসরণে প্রেরণ করিয়াছিলাম; আর তাহাকে ইন্‌জীল প্রদান করিয়াছিলাম যাহাতে হেদায়াত ও নূর ছিল এবং উহা তাহার পূর্ববর্তী তওরাতে যাহা ছিল উহার সত্যায়নকারী এবং মুত্তাকীগণের জন্য হেদায়াত ও উপদেশস্বরূপ ছিল।

৪৮। এবং ইন্‌জীলের অনুসরণকারীদের উচিত, উহাতে আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন তদনুযায়ী যেন তাহারা ফয়সালা করে, এবং আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা ফয়সালা করে না, প্রকৃতপক্ষে তাহারাই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

৪৯। এবং আমরা তোমার উপর এই কিতাব সত্য সহকারে নাযেল করিয়াছি, যাহা ইহার পূর্বে যে কিতাব রহিয়াছে উহার সত্যায়নকারী এবং উহার উপর তত্ত্বাবধায়নকারী রূপে[৭৫২]; অতএব, তুমি তদনুযায়ী তাহাদের মধ্যে ফয়সালা কর যাহা আল্লাহ্ নাযেল করিয়াছেন আর যে সত্য তোমার নিকট আসিয়াছে উহা ছাড়িয়া তুমি তাহাদের মন্দ কামনা-বাসনার অনুসরণ করিও না। আমরা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীয়ত[৭৫৩] (বিধান) এবং (স্পষ্ট) কার্য-পদ্ধতি নির্ধারিত করিয়াছি। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তিনি তোমাদের সকলকে এক উম্মত করিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের উপর যাহা নাযেল করিয়াছেন তদ্‌সম্বন্ধে তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহেন। অতএব তোমরা সৎকাজে একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্‌র দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে, তখন তিনি তোমাদিগকে ঐ বিষয়ে অবহিত করিবেন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিয়া আসিতেছিলে।

৭৪৮। এই আয়াতের তাৎপর্য ইহা নয় যে, রসূলে করীম (সঃ)-এর সময়ে তওরাত যে অবস্থায় ছিল; সেই অবস্থায়ই ইহা বিবাদ মীমাংসার জন্য আল্লাহ্‌র বিচার-বাণীরূপে ব্যবহার-যোগ্য ছিল। কুরআন শুধু এতটুকু বলিতে চায় যে, তওরাতের সম্বন্ধে ইহুদীদের ধারণা এইরূপ ছিল। তবে এই কথাও বলা প্রয়োজন যে, তওরাতের বর্তমান অবস্থায় ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্য বিবর্জিত, তাহাও কুরআন মনে করে না। কুরআনের মতে, তওরাতে মানুষের ব্যাপক হস্তক্ষেপ হওয়া সত্ত্বেও ইহাতে কতকগুলি সত্য কথা মৌলিক ও সাবেক আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে (২ঃ৭৯)। এই আয়াতটি ইহাও ব্যক্ত করে যে, তওরাত ইহার মৌলিক আকার ও পবিত্রতায়, বনী ইসরাঈল জাতির জন্য সীমাবদ্ধ সময় পর্যন্ত সত্য ধর্মগ্রন্থরূপে সঠিক ছিল। কিন্তু কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর, ইহাই হইল সর্বকালের সর্বমানবের জন্য একমাত্র আল্লাহ্ অনুমোদিত ধর্মগ্রন্থ।

৭৪৯। ৪৩২-ক টীকায় বলা হইয়াছে–রব্বানীয়িন, রব্বানী শব্দের বহুবচন, যাহার অর্থ হইল: (১) যিনি ধর্মকাজে নিয়োজিত থাকেন কিংবা ধর্মীয় সাধনায় নিমগ্ন থাকেন, (২) আল্লাহ্ সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান আছে, (৩) যিনি ধর্মজ্ঞানে পাণ্ডিত্য রাখেন, ভাল ও ধার্মিক লোক (৪) প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষক, যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম ধর্মগুলি শিক্ষা দিয়া মানুষকে উচ্চধাপের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করেন।

৭৫০। 'আহ্‌বার' শব্দটি 'হিবর'-এর বহুবচন, যাহার অর্থ ইহুদীদের পণ্ডিত ব্যক্তি; সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তি (লেইন)। এই আয়াতে কুরআন পূর্ব-বর্ণিত আয়াতে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছে, তাহা আরও জোরদার করিয়াছে। অর্থাৎ মূসা (আঃ)-এর পরবর্তী নবীগণও যখন তওরাত অনুযায়ী মীমাংসা করিয়াছেন, তখন অন্য কে আছে যে, তাহাদের ঝগড়া-বিবাদ তওরাতের নিয়ম অনুযায়ী মীমাংসা করিবে না?

৭৫১। যাত্রাপুস্তক–২১ঃ২৩-২৫ এবং লেবীয় পুস্তক ২৪ঃ১৯-২১ দেখুন। 'যে ব্যক্তি-দাবী প্রত্যাহার করে' বাক্যাংশটি ক্ষমার মাহাত্ম্য কীর্তন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌জীলে ক্ষমা করা একচেটিয়া শিক্ষা বলিয়া খৃষ্টানদের গর্ব তাহাও খর্ব করে। মূসা (আঃ)-এর শিক্ষাতেও ক্ষমার স্থান ছিল। তবে মূসা (আঃ)-এর শিক্ষার প্রতিশোধ গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল, আর ঈসা (আঃ)-এর শিক্ষাতে ক্ষমা ও প্রতিরোধহীনতার উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল।

৭৫২। 'মুহায়মিন' মানে সাক্ষী, শান্তি ও নিরাপত্তাদানকারী মানুষের কার্যাবলীর নিয়ামক ও পর্যবেক্ষক; অভিভাবক ও রক্ষাকারী (লিসান)। এখানে কুরআনকে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলির রক্ষক ও অভিভাবক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই অর্থে ইহা রক্ষক ও অভিভাবক যে, কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের অমর ও চিরস্থায়ী শিক্ষাসমূহ ও মূল্যবোধগুলিকে নিজের মধ্যে সংরক্ষণ ও আত্মস্থ করিয়াছে এবং যে শিক্ষা ও মূল্যবোধসমূহ সাময়িক প্রয়োজনের তাকিদে ঐ গ্রন্থগুলিতে সংযোজিত হইয়াছিল এখন মানবজাতির প্রয়োজন উপযোগী নহে সেগুলিকে কুরআন নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নাই। কুরআনের অভিভাবকত্বে এই অর্থেও স্বীকার্য যে, কুরআন আল্লাহ্‌র হেফাযতের প্রতিশ্রুতি দ্বারা সম্পূর্ণ হস্তক্ষেপ-মুক্ত রহিয়াছে। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহ ঐশী হেফাযতের এই মহা আশীর্বাদ হইতে বঞ্চিত।

৭৫৩। 'শিরয়াহ্' বলিতে আল্লাহ্‌তাআলার বিধানের নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ধর্মসম্পর্কিত অধ্যাদেশগুলিকে বুঝাইয়াছে; বিশ্বাস ও আচরণের প্রকাশ্য ও সত্য পথ (লেইন) 'মিন্‌হাজ' মানে প্রকাশ্য, সহজবোধ্য পথ ও পন্থা (লেইন)। আল্ মুবার্‌রাদ বলেন, প্রথমোক্ত শব্দটি রাস্তাটির প্রারম্ভ বুঝায় এবং পরবর্তী শব্দটি চলন-অধ্যুষিত রাস্তাটিকে বুঝায় (কদীর)। অতএব 'শিরয়াহ্' ঐসব আইনকে বুঝায় যেগুলি আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত এবং 'মিনহাজ' জাগতিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত। 'শিরয়াহ্'র আরেক অর্থ হইল পানিতে উপস্থিত হওয়ার পথ। ইহাতে বুঝা যায়, মানবকে আল্লাহ্‌তাআলা এমন সব উপায়-উপকরণ দ্বারা ভূষিত করেছেন যাহাতে সে আধ্যাত্মিক পানির প্রস্রবণে পৌঁছিতে পারে ও ঐশী বাণী লাভ করিতে পারে।

হাদীস শরীফ

হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۝ وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۝

অর্থাৎ, হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁর দিকে আহ্‌বানকারী এবং দীপ্তিমান প্রদীপরূপে *(সূরা আল্ আহযাব-৪৬-৪৭)*।

হাদীস : 'আন আবি হুরায়রাতা ক্বলা ক্বলা রসূলুল্লাহে সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আনা সাইয়্যেদু উলদে আদামা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতে ওয়া আওওয়ালু মাই ইয়ানশাক্কু আনহুল কাবারু ওয়া আওওয়ালু শাফেইন ওয়া আওওয়ালু মুশাফ্‌ফাইন *(মুসলিম)*।

অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়াত করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন যে, আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের নেতা হবো, আর আমি সেই ব্যক্তি যার কবর সর্বপ্রথম বিদীর্ণ হবে। আমিই সর্বপ্রথম শাফাআতকারী হবো এবং আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম কবুল করা হবে *(মুসলিম)*।

ব্যাখ্যা : হযরত আকদস মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এ জগতের মধ্যমণি, তাঁর (সঃ) আগমনে তৌহীদ ও স্রষ্টার অপরূপ জ্যোতিতে এ জগত দীপ্তিমান হয়েছে। তিনি এমন সূর্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন যা শুধু এ জগতকেই নয় বরং আলামীন বা বিশ্বজগতকে কিয়ামতকাল অবধি স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় রাখবেন। তাঁর (সঃ) শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করা মানবের সাধ্যাতীত। তিনি সেই সত্তা যাঁর প্রশংসা স্বয়ং খোদাতাআলা করেন এবং ফিরিশ্‌তা ও মানবমণ্ডলী প্রেরণ করে তাঁর (সঃ) প্রতি দরূদ। কুরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস হতে হযরত নবী করীম (সঃ)-এর অনুপম ব্যক্তিত্বের দর্পণ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। তিনি (সঃ) শুধু যে জগতের দীপ্তিমান সূর্য তা নয় বরং পরকালেরও আলোকবর্তিকা। তাঁর (সঃ) সত্তা এ দুনিয়াতে যেভাবে কল্যাণ বন্টনকারী পরকালেও তিনি (সঃ) মানবমণ্ডলীকে তাঁর কল্যাণের দ্বারা উপকৃত করবেন। পৃথিবীতে শুধু একজনই এমন হয়েছেন যাকে দু'জাহানের জন্য সূর্য বানানো হয়েছে অর্থাৎ যার কল্যাণ দু'জগতেই সমভাবে মানবের কল্যাণ ঘটাবে। তিনিই সকল কল্যাণের উৎস। কেয়ামত দিবসে খোদাতাআলা যাকে সর্বপ্রথম উত্থিত করবেন, যিনি সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাবেন এবং যিনি সুপারিশ করার অধিকার পাবেন তিনি হলেন, আমাদের নবী হযরত রসূল করীম (সঃ)। যুগ-ইমাম হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন :

"আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকি এই আরবী নবী, যাঁর নাম মুহাম্মদ, হাজার হাজার দরূদ ও সালাম তাঁর উপর। তিনি উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নয়। খোদাতাআলা, যিনি তাঁর (সঃ) অন্তরের গোপন রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁর সকল উদ্দেশ্য ও সকল আকাঙ্ক্ষাকে তিনি (আল্লাহ্) তাঁর (সঃ) জীবদ্দশাতেই তাঁকে (সঃ) সফলতা প্রদান করেছেন, সকল ফয়েয ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই।

(রূহানী খাযায়েন, ২২ খণ্ড, ১৪৪ পৃ.)

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে মহানবী (সঃ)-কে অনুকরণ করার এবং তার (সঃ) প্রেমে বিভোর হয়ে খোদার সান্নিধ্যে পৌঁছার তৌফীক দিন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা–মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী

অমৃত বাণী

আল্লাহ্‌র পথে ত্যাগ

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

"আমি সেই অস্তিত্বের শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ যে, আমি খোদাতাআলার (খোদাতাআলা একথা জানেন) তরফ হতে প্রেরিত হয়েছি।

তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর উত্তম সাক্ষী যে, সেই বস্তু যা তাঁর পথে সর্বপ্রথম আমাকে প্রদান করা হয়েছে তা হলো সুষ্ঠু অন্তর অর্থাৎ এমন এক অন্তর যার প্রকৃত সম্পর্ক সম্মান ও প্রতাপের অধিকারী খোদা ব্যতিরেকে অন্য কারো সঙ্গে ছিল না। আমি এককালে যুবক ছিলাম এবং এখন বুড়ো হয়েছি কিন্তু আমি জীবনের কোন অংশেই সম্মান ও প্রতাপশালী খোদা ছাড়া অন্য কারো সাথে প্রকৃত সম্পর্ক দেখতে পাইনি। এই প্রেমোত্তাপের কারণে আমি আদৌ এমন কোন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইনি যার ধর্ম-বিশ্বাস খোদাতাআলার মাহাত্ম্য ও একত্ববাদের পরিপন্থী অথবা উহাতে কোন প্রকারের অপমান অনিবার্য প্রকাশ পেতো। এই কারণেই আমি খৃষ্টধর্ম পসন্দ করতে পারলাম না কারণ উহার প্রত্যেক কদমেই সম্মান ও প্রতাপের অধিকারী খোদার অপমান রয়েছে। এইরূপে হিন্দুধর্ম যার একটি শাখা হলো আর্যধর্ম, উহা সত্যতার মর্যাদা হতে সম্পূর্ণ নীচে নিপতিত। তাদের দৃষ্টিতে বিশ্বজগতের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুই অনাদি, যার কোন সৃষ্টি-কর্তা নেই, সুতরাং হিন্দুদের সেই খোদার উপর বিশ্বাস নেই, যিনি ব্যতিরেকে কোন বস্তুই বর্তমান থাকতে পারে না।

মোট কথা, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে, এই দুই ধর্মই সত্যতা ও বাস্তবতার পরিপন্থী, এবং খোদাতাআলার পথে যত প্রতিবন্ধকতা ও নৈরাশ্য এই দু'টি ধর্মের মধ্যে রয়েছে আমি সবগুলি এই পত্রিকায় লিখতে পারবো না, কেবল সংক্ষেপে লিখছি যে, সেই খোদা যাকে সকল পবিত্র আত্মা অন্বেষণ করে থাকে এবং যাকে পেলে মানুষ ইহজীবনেই মুক্তি পেতে পারে এবং তার উপর ইলাহী নূরের দুয়ার উন্মুক্ত হতে পারে এবং তাঁর পূর্ণ মা'রেফত ও পরিচয়ের মাধ্যমে পূর্ণ মহব্বত সৃষ্টি হতে পারে, সেই খোদার দিকে এই দু'টি ধর্মই পথ প্রদর্শন করে না পরন্তু ধ্বংস গহ্বরে নিক্ষেপ করে। এইরূপে ইহাদের অনুরূপ দুনিয়াতে আরো অনেক ধর্ম রয়েছে কিন্তু ঐ সব ধর্ম এক-অদ্বিতীয় খোদা পর্যন্ত পৌছাতে পারে না বরং সত্যান্বেষীকে গভীর তিমিরে নিক্ষেপ করে দেয়।

এগুলি ঐসব ধর্ম যেগুলিতে আমি চিন্তা করার জন্য জীবনের একটি বিরাট অংশ ব্যয় করে ফেলেছি এবং পরম সততার সাথে ও গভীর দৃষ্টিতে ঐগুলির বিধি-বিধানের উপর চিন্তা করেছি এবং সবগুলিকে হক ও সত্যতা হতে অনেক দূরস্থিত ও পরিত্যক্ত পেয়েছি। হ্যাঁ, এই কল্যাণময় মোবারক ধর্ম যার নাম ইসলাম ইহাই এক ধর্ম যা মানুষকে খোদা পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়। ইহাই এক ধর্ম যা মানবীয় প্রকৃতির প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম।

(অবশিষ্টাংশ ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ

বিভিন্ন দেশের লাজ্না (মহিলা সংগঠন)-সমূহের অসাধারণ সেবা ও অবদানের হৃদয়গ্রাহী বিবরণ ও অমূল্য উপদেশ

[সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)কর্তৃক, ইউ-কে সালানা জলসায় ১লা আগষ্ট '৯৮ প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর সূরা আলে ইম্রানের ১০৫ তম আয়াত তেলাওয়াত করেন। অতঃপর বলেন, এ আয়াতটিকে আমি আজকের এ ভাষণটির শিরোনাম স্বরূপ ধার্য করেছি। নারীজাতির প্রসঙ্গে দুনিয়াতে মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে বহু ধরনের ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে – যেমন অনেকে মনে করেন যে, ইসলাম নারীদের প্রাপ্য হক্-অধিকার তাদেরকে দেয় না, বা ইসলামে তাদেরকে সমাজের একটা নিষ্ক্রিয় বা নিষ্কর্মা অংশে পরিণত করা হয়েছে। হুযূর (আইঃ) বলেন, এ বিষয়ের ওপর পূর্বে আমি অনেকগুলো ভাষণে বিশদ আলোকপাত করেছি। **আজ আমি ইহা জানাতে চাই যে, আহ্মদী নারীসমাজ (ধর্মীয় সেবার) প্রত্যেক অঙ্গণে পুরুষদের চে' এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টার ময়দানে প্রবেশ করেছে এবং বহু ক্ষেত্রে বস্তুতঃ এগিয়ে গেছে।** হুযূর বলেন, সর্বপ্রথম ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের উল্লেখ আবশ্যকীয়।

হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাহাবীয়াত (রিযওয়ানুল্লাহে আলায়হিন্না) আতিথেয়তার প্রসঙ্গে এবং (ইসলামে) নবদীক্ষিতদের সেবাকার্যে অসাধারণ অবদান রাখেন। সাহাবীয়াতের ঐ সেই দৃষ্টান্তমূলক আদর্শ যা এই যুগেও আমরা আহ্মদী নারীসমাজে পুনর্জীবিত হতে দেখতে পাচ্ছি, যারা বিশ্বব্যাপী প্রত্যেক দেশে ঐ সুন্নতকে উজ্জীবিত ও সমুন্নত করে চলেছেন।

ইসলামের সূচনাকালে যারা ইসলাম গ্রহণ করতো তাদেরকে বাধ্যতাবশতঃ তাদের বাড়ি-ঘর, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি এবং ধন-সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হতো। সেজন্যে বিরাট সংখ্যক ঐ মুহাজিরগণ মদীনায় (আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে) উপস্থিত হতেন। তাদের দেখাশোনার তেমন কোন নিয়মিত ব্যবস্থাপনা ছিল না, এই ব্যবস্থা ব্যতীত যে, আঁ হযরত (সাঃ) তাদেরকে মুসলমানদের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করতেন। হযরত উম্মে-শুরায়কের ওরূপ একটি গৃহ ছিল যেখানে তাঁরা ইসলামের সেবকদের ও নবদীক্ষিত মুসলমানদের আতিথেয়তার উদ্দেশ্যে নিজেদের ঐ গৃহটি যেন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। যে-জন্যে সেখানে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত ফাতেমা বিন্তে কায়স (রাঃ)-কে ওখানে তাঁর ইদ্দতকাল যাপনের এ জন্যে অনুমতি দেননি যে, তাঁদের গৃহে মেহ্মানদের সংখ্যাধিক্যের দরুন পর্দার ব্যবস্থা সম্ভব ছিল না। কেননা, যে-গৃহে বহুল সংখ্যক মানুষের আনাগোনা হয় সেখানে ইদ্দৎ পালন দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। (সহী মুসলিম, কিতাবুত্-ত্বালাক)

সাহাবা কেরামের এই রীতি ছিল যে, বিভিন্ন যুদ্ধাভিযান কালে যারা তাঁদের সেবা করতো তাদেরও যত্নের দিকে তাঁরা বিশেষ খেয়াল রাখতেন। ঐ সেবার দরুন তাঁদের অন্তরে কৃতজ্ঞতাবোধ সদা জাগরূক থাকতো। এ সম্পর্কীয় একটি মহান দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর বলেন, একটি গাযওয়াতে (যুদ্ধে) সাহাবা কেরাম তৃষ্ণাকাতর অবস্থায় পানির সন্ধানে বেরুলেন। তখন সৌভাগ্যক্রমে একজন মহিলাকে পাওয়া গেল যাঁর কাছে এক মশক পানি (সংরক্ষিত) ছিল। সাহাবা তাকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত করলেন। তিনি (সঃ) তখনই তাকে তার পানির মূল্য পরিশোধ করলেন। তারপর সাহাবীগণ সেই পানি ব্যবহার করলেন। তার ঐ সেবার মূল্য যদিও সে পেয়ে গিয়েছিল তবুও উহাকে তার এহ্সান (–অনুগ্রহ) স্বরূপ জ্ঞান করলেন এবং ঐ 'অনুগ্রহের' খেয়াল এতো দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁদের হৃদয়ে পোষণ করেন যে, পরবর্তীকালে ইসলামী যুদ্ধগুলোতে যখন সেই এলাকা জয় করা হয় তখন বিশেষ নির্দেশাধীন ঐ মহিলাকে তার পরিবার-পরিজন ও ঘর-বাড়ী সহ স্পর্শ পর্যন্ত করা হয় নি। এর ফলশ্রুতিতে সে নিজেই মুসলমান হয়ে যায় এবং তার পরিবার ও সমগ্র গোত্রও" (সহী বুখারী, কিতাবুল গোস্লে)। হুযূর বলেন, **ইসলাম নৈতিক উৎকর্ষ ও মাধুর্যের দ্বারা বিস্তার লাভ করেছে, আর নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে আহ্মদী মহিলাদেরকে এখনও অনেক চেষ্টা-প্রয়াস চালাতে হবে।**

হুযূর তবলীগ প্রসঙ্গে লাজ্না ইমাইল্লাহ্-ঘানার অসাধারণ কর্ম-প্রয়াসের সপ্রশংস উল্লেখ করে বলেন, সেখানকার মহিলাদের **এই সংগঠনের সদস্যরা মেহ্মানদারীর কর্তব্যসমূহ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পালন করছেন। তবলীগের ক্ষেত্রে তারা কেবল মেহ্মানদারীর মাধ্যমেই খিদমত পালন করছেন না, বরং সাংগঠনিক উপায়ে ধর্মীয় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নিয়মিত নিজস্ব স্কুলসমূহও স্থাপন করেছেন, যেখানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মেয়েছেলেরা এসে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। তাদের আরেকটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত, যা ইউরোপের জামাতসমূহেরও অবলম্বন করা উচিত, তা হচ্ছে, যারা কোন সময়ে আহ্মদী ছিল ঐ সমস্ত মহিলাদের ফিরিস্তি প্রণয়ন করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং পুনরায় তাদেরকে আহ্মদী বানাতে এবং যারা আহ্মদীয়তে দুর্বল হয়ে পড়েছে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন উপায়ে তাদেরকে আহ্মদীয়তে সচেতন ও সক্রিয় করে তুলতে ফলপ্রসূ চেষ্টা-প্রয়াস চালান। তাছাড়া, চিকিৎসাগত সাহায্যের মাধ্যমেও তাঁরা অবদান রাখেন।**

তবলীগি কর্মপ্রয়াসে সবচে' প্রভাবশীল উপায়-স্বরূপ হচ্ছে তা'লীমুল কুরআন ব্যবস্থা। হুযূর বলেন, আল্লাহ্তাআলার ফযলে, আমি লাজনার দিক থেকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট যে, তারা উক্ত উপায়ে বয়স্ক ও ছোট– সব শ্রেণীর মেয়েদের সুষ্ঠুভাবে খিদমত করছেন বিশেষতঃ পাকিস্তান, হিন্দুস্থান, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, ইন্দোনেশীয়া এবং ঘানায় – পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত প্রায় সব দেশে এই খিদমত পালন করছেন। বস্তুতঃ এর দ্বারাও পরোক্ষভাবে তবলীগের উপকার ও অগ্রগতি সাধিত হয়, **যদিও এই খিদমতের ক্ষেত্রে আহ্মদী হওয়ার কোন শর্ত নেই।** হুযূর বলেন, **পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ ইত্যাদি দেশগুলোতে অত্যন্ত হিকমতের সঙ্গে মহিলাদেরকে এই খিদমত পালন করতে হয়।** হুযূর উপদেশ দান করেন যে, **তবলীগ এবং কুরআন-সেবার কাজটিকে কোথাও হিকমত ব্যতিরেকে বাড়ানো যেতে পারে না।** সেজন্য হিকমতের সঙ্গে এরূপে এই খিদমত পালন করুন, যার ফলে কোন দুষ্টলোক দুষ্টামি করার কোন সুযোগ না পায়। **কুরআন শিখানো ছাড়াও, কুরআন ছড়ানো– উহার বিলিবন্টনও খিদমতের একটি উপায়।** আল্লাহ্তাআলার ফযলে জার্মানীতে বসবাসরত নবদীক্ষিতা একজন আলবেনীয় আহ্মদী মহিলা কুরআন করীমের আলবেনীয় তরজমার একশ' কপি আলবেনীয় জাতির মাঝে বিতরণ করেন। বিভিন্ন ভাষায় এসকল

তরজমা ও তফসীর যেহেতু আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, সেহেতু এগুলোর বিতরণের দ্বারা আহ্‌মদীয়তের দিকেও মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তারা তুলনা করলে সহজেই বুঝতে পারেন, আহ্‌মদীদের তরজমাসমূহ মানে-গুণে অন্যান্য তরজমার চেয়ে অনেক শ্রেয়ঃ এবং বিশুদ্ধ। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে এর ফলশ্রুতিতে তাঁদের হৃদয় আপনা-আপনি আহ্‌মদীয়তের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে।

আরেকটি খিদমত তারা এই পালন করছেন যে, নবদীক্ষিত আহ্‌মদীদের তা'লীম-তরবীয়তের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে এবং আল্লাহ্‌র ফযলে জার্মান, বসনিয়ান, আলবেনিয়ান, রুমানিয়ান এবং আফগানী মহিলাদের মধ্যে 'মুয়াল্লেমাত' (–শিক্ষিকা) গড়ে তোলা হচ্ছে। কোন কোন জায়গায় কেন্দ্রীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ এই কাজ করেননি, বরং স্থানীয় লাজনা এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

অতঃপর হুযূর ইন্দোনেশিয়ার লাজনার উদাহরণ তুলে ধরেন এবং বলেন যে, একটি গ্রামকে তবলীগের উদ্দেশ্যে তাঁরা চিহ্নিত ক'রে সেই গ্রামের সুবিধার্থে "ওকারে আমলের" মাধ্যমে সেখানে তিন কিলোমিটার সুদীর্ঘ সড়ক নির্মাণ করেন। এই খিদমতের এরূপ প্রভাব পড়ে এবং কৃতজ্ঞতাবোধ সৃষ্টি হয় যে, জামাতের দিকে সাধারণভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং এ যাবৎ পাঁচশ' ব্যক্তি আহ্‌মদী হয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে হুযূর কতিপয় বিষয়ের প্রস্তাবনা উপস্থাপন করে বলেন যে, অধিকাংশ দেশেই অধিকাংশ লাজনার পক্ষে বাইরে বেরিয়ে **'ওকারে-আমল' করা সম্ভবপর নয়, কিন্তু একটি 'ওকারে-আমল' এর সুপ্রশস্ত ময়দান খোলা রয়েছে। আর তা হচ্ছে, গরীব গৃহগুলোতে গিয়ে 'ওকারে-আমল' করুন।** বস্তুতঃ এই 'গরীব গৃহসমূহ' দুনিয়ার সবচে' ধনী দেশগুলোতেও (খোঁজ করলে) পাওয়া যেতে পারে। সেজন্যে যদি আল্লাহ্‌র তুষ্টিলাভের উদ্দেশে (–নিয়্যতে) ওরূপ গৃহগুলোতে যান এবং তাদের খিদমত করেন, তাহলে ওরূপ খিদমতকারিণীদের খিদমতের ফলশ্রুতিতে ইসলাম সম্পর্কে বহু ধরনের ভুল বুঝাবুঝির নিরসন হবে।

হুযূর বলেন, **দুনিয়া জুড়ে লাজনাসমূহ ঐরূপ গৃহগুলোতে খোঁজ নিয়ে তাদেরকে জীবন যাপনের প্রকৃত আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিন। যাতে পাশ্চাত্য (জগৎ) মনে না করে যে, তারাই বসবাসের শিষ্টাচার ও বিধি-বিধান শিখিয়ে থাকে। বরং ইসলামের এই খিদমতকারিণী আহ্‌মদী মহিলাগণ তাদেরকে ইহা শিখিয়ে থাকে।** হুযূর বলেন, আশে-পাশের অন্যান্য মহিলাদেরকেও এই নেক কাজে শরীক করুন। ইহা মানবজাতির অনেক বড় খিদমত সাব্যস্ত হবে। হুযূর বলেন, **যদি লাজনাসমূহের কাছে অথবা ব্যক্তিগতভাবে খিদমত পালনকারিণীদের কাছে এ ক্ষেত্রে যে সাধারণ খরচ-পাতির প্রয়োজন হবে, তা না থাকে, তাহলে আমাকে তারা লিখুন। আমি ইনশাল্লাহ্‌ ব্যবস্থা করিয়ে দিবো।**

অতঃপর হুযূর বিশেষভাবে, জার্মানীর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র তবলীগী কর্ম-প্রয়াসের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তাদের একটি পদ্ধতি হচ্ছে যে, বিশেষভাবে মহিলাদের উদ্দেশে তারা তবলীগী স্টল স্থাপন করে থাকেন। এই সব স্টলের দরুন ইসলাম সম্পর্কে যারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল তারা সেখান থেকে বই-পুস্তক নিয়ে ইসলামের সহিত পরিচিত হয়।

হুযূর বলেন, **লাইব্রেরীগুলোতে জামাতের বই-পুস্তক রাখাও অনেক বড়ো একটি কাজ।** এতো বড়ো কাজ যে, ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে আপনারা তা অনুমানও করতে পারেন না। শুধুমাত্র যুক্তরাজ্যেই এক লাখের বেশী লাইব্রেরী হতে পারে। লাইব্রেরীতে আহ্‌মদী সাহিত্য (–বই-পুস্তক) পৌছানো অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য কাজ। তারপর লাইব্রেরীয়ানদেরকে আশ্বস্ত করা যে, এই লিটারেচার তাদের লাইব্রেরীর শ্রীবৃদ্ধির কারণ হবে এবং সকলের জন্যে উপকারী হবে।

হুযূর বলেন, এই ময়দানে আহ্‌মদী মহিলাদের জন্যে এক খোলা দৌড়ের সুযোগ রয়েছে, এবং আমি চাই, আহ্‌মদী মহিলারা যেন 'ফাস্তাবিকুল খয়রত' (–'নেক কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর')-এর আদেশাধীন ভরপুর অংশগ্রহণ করেন, যা দেখে পুরুষরা লজ্জিত হন।

হুযূর বলেন, এম-টি-এ'র মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ফযলে যে খিদমত সাধিত হচ্ছে। এবং সমস্ত প্রোগ্রাম দেখা বা ওগুলোর ভিডিও রেকর্ডিং করা প্রত্যেক গৃহবাসীর পক্ষে সম্ভব নয়। এ ছাড়াও তাদের অন্যান্য প্রয়োজন রয়েছে। সেজন্য যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব, ততটুকু এম-টি-এ থেকে যথাসাধ্য ফায়েদা লাভ করা প্রত্যেকের কর্তব্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হুযূর উর্দূ ক্লাসের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, এর দ্বারা তারাই সত্যিকারভাবে উপকৃত হতে পারেন যারা খাতা-কলম নিয়ে বসেন এবং জরুরী কথাগুলো নোট করেন। কিন্তু এতে নিয়মিত পুরোপুরি মনোযোগ কোন সহজ কাজ নয়। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় বিভাগের সাথে যোগাযোগ ক'রে সূচনা থেকে এই ক্লাসের ভিডিওসমূহ সংগ্রহ করা এবং সেগুলো থেকে বাচ্চাদের সহ প্রকৃতরূপে উপকৃত হবার এক সহজতর নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দান করেন। হুযূর আরও বলেন, সবাই **যখন উর্দূ শিখবেন তখন এর ফলে তারা হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর রচনাবলী উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। আর সেদিক থেকে উর্দূর অবস্থান আন্তর্জাতিক ও বিশ্বজনীনও বটে – সেজন্যেই আমি এর ওপর জোর দিয়ে থাকি। তবে প্রত্যেক দেশে আপনারা সে-দেশের ভাষা, ধর্মের স্বার্থ এবং ঐসব দেশের অধিবাসীদের হৃদয় জয় করার উদ্দেশ্যে শিখতে সচেষ্ট হোন। কোনও ভাষার ক্ষেত্রে কখনও কোন বিদ্বেষের অবকাশ নেই।** যদি আপনারা দেশীয় এবং স্থানীয় ভাষা শিখেন এবং মজলিসগুলোর যথাযথ হক্ আদায় করেন তাহলে অবধারিতভাবে সে-দেশের আগন্তুক মহিলারা অনুধাবন করবেন যে, তারা আপনাদের অন্তর্ভুক্ত এবং আপনারা তাদের। তখন তারা জামাতের সব রকম কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণের জন্য নিজেদেরকে পেশ করবে।

হুযূর বলেন, জার্মানীর একটি বিশেষত্ব এই যে, তারা মহিলাদের জন্যে আলাদাভাবে তবলীগী অধিবেশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। আর আমি আশা করি, তারা প্রশ্নাবলীর সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে থাকবেন। হুযূর বলেন, এ প্রসঙ্গে আমার প্রশ্ন-উত্তরমূলক ক্যাসেটগুলোকে যেন যথাযথ কাজে লাগান। উল্লেখিত খিদমতগুলোর বিস্তার দেওয়া আবশ্যকীয়।

হুযূর বলেন, হযরত মুসলেহ্‌ মাওউদ (রাঃ) বলেছিলেন যে, আপনারা যদি শতকরা পঞ্চাশভাগ মহিলাদের ইস্‌লাহ্‌ (সংশোধন) করতে সমর্থ হন তাহলে তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এরূপ তরবীয়ত করতে সক্ষম হবে যে, তারা আগামীতে যুগ-যুগ ব্যাপী ঐ সকল মা-তে পরিণত হবে যাদের পায়ের নীচে জান্নাত লাভের ওয়াদা রয়েছে। কিন্তু আক্ষেপের সঙ্গে বলতে হয় যে, এখনও শতকরা একভাগেরও ইস্‌লাহ্‌ হয় নি। অধিকাংশ মহিলাই এরূপ, নামাযের প্রারম্ভিক ও আক্ষরিক বিষয়-বস্তুও যাদের মুখস্ত নেই, কুরআন করীমের সঠিক শিক্ষা তো দূরে থাক সঠিকভাবে পড়তেও পারে না। অতএব, লাজনার মাধ্যমে আপনাদের কাছে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় (পয়গাম) পৌছান এমনিতেই সম্ভব নয়। যারা আমার কথা শ্রবণ করছেন, আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকের আমি কর্ণগোচর করছি এবং

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাচনভঙ্গীতে বলছি যে, **'মানুষের শ্রুতিগোচর করার জন্যে আমি কোন্ জয়ঢাক দিয়ে ঘোষণা করবো যাতে শুনার জন্য তাদের কান উন্মুক্ত হয়।' এখনও 'আমলি (ফলিত) তরবীয়তের ক্ষেত্রে বিশাল শূন্যতা রয়েছে। একটাই উপায় আছে যে, মায়েরা নিজেদের আরদ্ধ দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিক দিয়ে সজাগ হোন।** হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পবিত্র হাদীস 'মায়েদের পদতলে জান্নাত অবস্থিত'– তদনুযায়ী নিজেদের সন্তানদের জন্যে জান্নাত সৃষ্টি করুন। বস্তুতঃ ঐ সকল মায়েদের পদতলে জান্নাত অবস্থিত, যারা তাদের সন্তানদেরকে আবশ্যকীয় সব নেক বিষয় শিখান।

হুযূর বলেন, আমি এখন এই ভাষণ সমাপ্ত করার পূর্বে এক পুণ্যবতী মহিলার উদাহরণ আপনাদের সম্মুখে রাখতে চাই। এ দ্বারা আপনাদের বোধগম্য হবে যে, ধর্মীয় খিদমতসমূহ পালনের জন্য শুধু এল্‌ম (জ্ঞান) আবশ্যক নয়, বরং অন্য এক বিষয় যা আবশ্যকীয়। হুযূর বলেন, হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের (রাঃ) পুণ্যবতী মা মহিলাদেরকে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত করতেন। একবার তাঁর নিকট এর কারণ জিজ্ঞেস করাতে তিনি বলেন, "আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি–তাঁকে ভক্তি করি এবং তাঁকে ভালোবাসি।" হুযূর বলেন, তিনি ঐ দু'টি বাক্যে এতো মহান কথা বলে ফেলেছেন, যা আপনারা সাধারণভাবে কল্পনাও করতে পারেন না। আল্লাহ্‌কে ভয় করার প্রমাণস্বরূপ এই পেশ করেছেন যে, যাঁকে তিনি ভালবাসেন তাঁর সন্তুষ্টিলাভে যাতে কখনও বঞ্চিত হয়ে না পড়েন তাতে তিনি সদা ভীত ও সতর্ক থাকেন। সমস্ত উপদেশাবলী এক দিকে, আর এই কেন্দ্রীয় উপদেশটি আরেক দিকে– (তা এই যে,) দু'টি কাজ তোমরা পালন কর– **আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁকে ভালোবাস, তাহলে সমস্ত দুনিয়া আকৃষ্ট হয়ে তোমাদের সামনে এসে (ভক্তিতে) গড়িয়ে পড়বে।** (–তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি আসক্ত হও, দুনিয়া তোমাদের প্রতি আসক্ত হবে)। কেননা, মানবহৃদয়কে জয় করা ব্যতিরেকে মানব-মস্তিষ্ক– তার জ্ঞান-বুদ্ধিকে জয় করা সম্ভব নয়। অতএব, **এই ওজর-অজুহাত সঠিক নয় যে, আপনাদের শিক্ষা নেই, আপনারা ভাষা জানেন না। হুযূর বলেন, আমি এরূপ মহিলাদেরও প্রত্যক্ষ করেছি– যারা আল্লাহ্-ভীরু ও আল্লাহ্-প্রেমিক, তাদের নীরবতাও বাকশক্তিস্বরূপ হয়ে পড়ে** (– বক্তব্যের কাজ করে থাকে)।

ভাষণ শেষে হুযূর (আইঃ) সমবেতভাবে দোয়া করান।

('আল 'ফযল' ইন্টারন্যাশনাল থেকে অনূদিত)

মওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ
সদর মুরব্বী

অমৃত বাণী

(৪-এর পাতার পর)

ইসলামের খোদা কারো উপর কল্যাণ ও আশীষের দুয়ার বন্ধ করে না বরং তার দুই হাত তুলে আহ্‌বান জানায় যে, আমার কাছে এসো। যারা পূর্ণ শক্তির সাথে তার দিকে দৌড়ায় তাদের জন্য দুয়ার খোলা হয়। সুতরাং আমি খোদার ফযল ও আশীষের সাথে নিজ কোন কলা-কৌশল নয়, এই নেয়ামত হতে পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হয়েছি যা আমার পূর্ববর্তী নবী ও রসূলগণকে এবং খোদার মনোনীত বান্দাদিগকে প্রদান করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই নেয়ামত পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবই ছিল না যদি আমি আমার শিরোমণি ও মওলা নবীকুল সম্রাট ও মানব-শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পথ অনুসরণ না করতাম। সুতরাং আমি যা কিছু পেয়েছি তাঁরই অনুসরণের বদৌলতে পেয়েছি। আমি আমার সঠিক ও পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে অবহিত যে, কোন মানব এই নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ব্যতিরেকে খোদা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না, এবং না পূর্ণ মা'রেফত অর্জন করতে পারে।

যখন আল্লাহ্‌তাআলা যুগের বর্তমান অবস্থাকে লক্ষ্য করে এবং পৃথিবীকে নানা প্রকারের দুষ্কর্ম ও পাপ এবং বিভ্রান্তি দ্বারা পরিপূর্ণ দেখে আমাকে তবলীগের দায়িত্ব পালন করার ও সংশোধন করার কাজে নিয়োজিত করলেন এবং যুগটাও এমন ছিল যে, এ দুনিয়ার লোক এয়োদশ শতাব্দী অতিবাহিত করে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে উপনীত হয়ে গিয়েছিল তখন আমি সেই হুকুম পালনে সাধারণ লোকদের মধ্যে লিখিত বিজ্ঞাপনাদি দ্বারা এবং বক্তৃতার মাধ্যমে এই আহ্‌বান জানাতে আরম্ভ করলাম যে, এই শতাব্দীর শিরোভাগে খোদার তরফ হতে দীনে ইসলামের সংস্কারের জন্য যার আগমনের কথা ছিল তিনি আমিই, যেন সেই ঈমান যা পৃথিবী হতে উঠে গিয়েছিল উহা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করি এবং খোদাতাআলার নিকট হতে শক্তি প্রাপ্ত হয়ে, তাঁরই হাতের আকর্ষণের মাধ্যমে দুনিয়াকে সংশোধন, তাকওয়া এবং সত্যবাদিতার দিকে আকৃষ্ট করি এবং তাদের আকীদা ও বিশ্বাসগত ভুল-ত্রুটি আমলের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দূরীভূত করি। ইহার উপর যখন কয়েক বৎসর অতীত হলো তখন ঐশী যোগে আমার উপর পরিষ্কারভাবে ইহা প্রকাশ করা হলো যে, সেই মসীহ যিনি এই উম্মতের জন্য প্রথম হতে প্রতিশ্রুত ছিলেন এবং শেষ মাহদী যিনি ইসলামের অধঃপতনের যুগে এবং বিভ্রান্তি বিস্তৃত হওয়ার সময়ে প্রত্যক্ষভাবে খোদার নিকট যত হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং নূতনভাবে স্বর্গীয় দস্তরখান লোকের সামনে উপস্থাপনকারী তকদীরে ইলাহীতে অবধারিত ছিলেন, যার আগমন সম্পর্কে আজ হতে তের শ' (বর্তমান চৌদ্দশ') বৎসর পূর্বে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তিনি আমিই। এলাহী কথোপকথনসমূহ, রহমান খোদার বাক্যালাপসমূহ এত স্বচ্ছ ও অবিরতভাবে এ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যে, এ সম্পর্ক সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। প্রত্যেকটি ওহী যা অবতীর্ণ হতো উহা ইস্পাত-নির্মিত পেরেকের ন্যায় অন্তরে প্রোথিত ও প্রোথিত হচ্ছিল এবং এসব ইলাহী কথোপকথনে এমন আযীমুশ্‌শান ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছিল যা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কারভাবে পূর্ণ হতে থাকে। ঐগুলির ধারাবাহিকতা, ব্যাপকতা এবং অলৌকিক শক্তির মহিমা আমাকে এই কথা স্বীকার করতে বাধ্য করেছে যে, এইগুলি সেই এক-অদ্বিতীয় খোদার কালাম যার কালাম কুরআন মজীদ। আমি এস্থলে তওরাত ও ইন্‌জীলের নাম নিচ্ছি না কারণ তওরাত ও ইন্‌জীল হস্তক্ষেপকারীও রদবদলকারীদের হাতে এত রদবদল হয়েছে যে, ঐ কিতাবগুলিকে এখন খোদার কালাম বলা যেতে পারে না। মোট কথা ঐসব খোদার ওহী যা আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এমন নিশ্চিত ও অকাট্য বাণী যদ্বারা আমি খোদাকে পেয়েছি। ঐ সব ওহী কেবল স্বর্গীয় নির্দশনাবলী দ্বারা বাস্তব-ভিত্তিক বিশ্বাসের মর্যাদায়ই পৌঁছেনি পরন্তু উহার প্রত্যেকটি অংশ খোদাতাআলার কালাম কুরআন মজীদের পাশে উপস্থাপন করা হলো তখন ইহার মাপ অনুযায়ী সত্য প্রতিপন্ন হলো এবং ইহার সত্যায়নের জন্য বৃষ্টির ধারার ন্যায় স্বর্গীয় নিদর্শন নাযিল হলো"।

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতায়ন ১-২ পৃঃ)

অনুবাদ ঃ **আলহাজ্জ আবদুল আযীয সাদেক**
সদর মুরব্বী

হোমিওপ্যাথি

হোমিওপ্যাথি– সদৃশ বিধান চিকিৎসা

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম ও চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)

(কিস্তি-৩)

এলার্জি বিষয়ে গবেষণা থেকে আরেকটি দিক প্রতীয়মান হয়েছে। তা হলো আবহাওয়ায় আসন্ন পরিবর্তনসমূহ সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি টের পাবার অনেক পূর্বেই কোনো কোনো রোগী অনুভব করে ফেলেন। যেমন ধরুন, বিজলী চমকালে বা আবহাওয়া অস্থিতিশীল হলে কিছু কিছু রোগীর এলার্জি হয়ে যায়। গবেষণার মাধ্যমে যে আশ্চর্যজনক বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে তা হলো আবহাওয়ার বাহ্যিক পরিবর্তন আরম্ভ হবার আগেই, এমনকি সেই পরিবর্তনের লক্ষণ বৈজ্ঞানিক কোনো যন্ত্রে ধরা পড়ার আগেই এ ধরনের রোগীর মাঝে অস্থিতিশীল আবহাওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট এলার্জির লক্ষণাবলী প্রতিভাত হয়। আল্লাহ্‌তাআলা পাখিদেরকেও এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তারাও আবহাওয়া পরিবর্তনের পূর্বেই তা টের পেয়ে যায় আর কলরব করে উঠে।

হোমিপ্যাথি ঔষধ যে একেবারেই নিরাপদ অর্থাৎ এগুলোর অপব্যবহারেও কোন ধরনের ক্ষতি হয় না– এ ধারণা সঠিক নয়। এর উপমা এক অপারদর্শী চালক ও তার নিরাপদ গাড়ীর সাথে দেয়া যেতে পারে। গাড়ী যতই উন্নতমানের ও নিরাপদ হোক না কেন অপারদর্শী ও অজ্ঞ চালকের হাতে পড়লে সেটি বড়ই মারাত্মক সাব্যস্ত হতে পারে বৈকি! হোমিওপ্যাথি ঔষধকে এই অর্থে নিরাপদ বলা যায়, যদি রোগ নির্ণয় সঠিক হয় তবে এর অধিক ব্যবহারও ক্ষতিকর হয় না। কিন্তু রোগ নির্ণয়ই যদি সঠিক না হয় তাহলে ক্ষতির সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। এলোপ্যাথি ঔষধের ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় সঠিক হলেও তা ক্ষতিকর হতে পারে। যেমন ধরুন, এসপিরিন। নিত্য ব্যবহৃত একটি ঔষধ যা মাথা-ব্যথা ইত্যাদি আরোগ্যের কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যদি এটা নিয়মিত ব্যবহার করা হয় তাহলে এটা পাকস্থলী, অভ্যন্তরীণ ঝিল্লি আর কিডনীতে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। এলোপ্যাথি চিকিৎসক যতই পারদর্শী হন না কেন তাদের অপারগতা হলো, তাদের প্রয়োগকৃত ঔষধ একটি রোগ দূরীভূত করলেও আরেকটি সৃষ্টি করে ফেলে। হোমিওপ্যাথি ঔষধের নিরাপদ হবার বিষয়টা হোমিও চিকিৎসকদের উপর নির্ভরশীল। যদি এদের রোগ-নির্ণয় সঠিক হয় তাহলে যে পরিমাণ ঔষধই সেবন করানো হোক না কেন– সেটা ক্ষতিকর হবে না।

হোমিও ঔষধের বিবিধ প্রভাব ও গুণাগুণ যাচাই করার পদ্ধতিকে **লক্ষণ-পরীক্ষণ** বা **প্রুভিং** (Proving) বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার ঔষধের বিশেষত্ব অবগত হওয়ার একটি উৎস হলো হাজার হাজার বছরের বিস্তৃত মানব অভিজ্ঞতা। মানুষ নানাভাবে বিভিন্ন বিষ ব্যবহার করে এসেছে যার মাধ্যমে এদের বিশেষত্ব আর প্রভাব জানা গেছে। আজ থেকে ২৫০০ বছর পূর্বে সক্রেটিসকে যে বিষ দেয়া হয়েছিল তার নাম ছিল কোনিয়াম (Conium)। এর আগেও মানুষ এই বিষের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান রাখতো। আর কিছু নতুন নতুন তথ্য যতক্ষণ সক্রেটিসের সাধ্যে ছিল তিনি তাঁর শিষ্যদের দ্বারা লিপিবদ্ধ করান। মৃত্যুকালেও তিনি এভাবে মানব সেবা করে গেছেন। তাঁর শরীরে বিষ-ক্রিয়া আরম্ভ হলে ক্রমাগতভাবে এই বিষের কী কী প্রভাব শরীরের কোন্ কোন্ অংশে পড়ছে ধারাবাহিকভাবে তিনি তা তাঁর শিষ্যদের বলে যান। একইভাবে, আরও নানা ঐতিহাসিক ঘটনা আর অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ বিষের গুণাগুণ সম্বন্ধে জানতে পেরেছে। ডাক্তার হ্যানিম্যান জানতে পারলেন, যদি কোনো বিষ স্বল্প মাত্রায় বার বার শরীরে প্রয়োগ করা হয় তাহলে সেই বিষের অনেক সূক্ষ্ম লক্ষণাবলী প্রতিভাত হয় অথচ শরীরে এর নেতিবাচক প্রভাব স্থায়ী হয় না। এতে মানবদেহ প্রভাবিত হয় ঠিকই কিন্তু শরীর এতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। বিনা প্রয়োজনে এই প্রক্রিয়াকে চালু না রাখলেই হলো। এই প্রক্রিয়াকে প্রুভিং (Proving) বলা হয়।

হোমিওপ্যাথি মেটিরিয়া মেডিকা সংকলনের ক্ষেত্রে এর দ্বারা অনেক কাজ নেয়া হয়েছে। তবে কেবল একজনের পরীক্ষণের উপর নির্ভর করা হয় না। বিভিন্ন প্রকার মানসিক ও শারীরিক লক্ষণাবলী সম্বলিত মানুষদের লক্ষণাদি লিপিবদ্ধ করার পর তাদের উপর বিষদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। পর্যবেক্ষণ চলাকালে এরা একে অপরের সাথে কোনো ধরনের পরামর্শ করতে পারেন না। কি ধরনের ভেষজ বা খনিজ দ্রব্যের দ্রবণ প্রয়োগে তাদের উপর পরীক্ষণ চালানো হচ্ছে – এটাও তারা জানতে পারেন না। এছাড়া বিভিন্ন ঋতুতে এই নিরীক্ষণকে REPEAT করা হয়। উক্ত পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণাধীন দ্রবণের যে-সব প্রভাব মস্তিষ্ক ও দেহের উপর পরিলক্ষিত হয় হোমিও পর্যবেক্ষক সতর্কতার সাথে তা সংকলন করে যান। সবগুলো ফলাফল তুলনামূলক যাচাই ও মূল্যায়ণের পর কোন্ ঔষধের কী কী প্রভাব–এর সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়।

এ ধরনের পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে ডাক্তার হ্যানিম্যান মানসিক লক্ষণাদিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছেন। যদি কোনো রোগীর বিশেষ ধরনের মানসিক লক্ষণাদি থাকে তাহলে তার বেশীরভাগ শারীরিক ব্যাধিতে সেই একই লক্ষণাদি সৃষ্টিকারী বিষ হোমিও ঔষধ আকারে প্রয়োগ করলে অবশ্যই লাভ হবে।

হোমিওপ্যাথি ঔষধের সেবন মাত্রা

কত শক্তির ঔষধ প্রয়োগ করতে হয় – এ বিষয়ে হোমিও চিকিৎসকরা একমত হতে পারেন নি। সবাই নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে ঔষধের শক্তি নির্দিষ্ট করে থাকেন। সাধারণভাবে স্বীকার করা হয়, ৩০ (ত্রিশ) শক্তির ঔষধ দৈনিক দু'তিনবার কিম্বা এর চেয়েও অধিকবার প্রয়োগ করা যেতে পারে। এতে কোনো ক্ষতি হয় না। একে মধ্যম শক্তিসম্পন্ন ঔষধ বলে গণ্য করা হয়। হোমিওপ্যাথি প্রণালীতে ঔষধ বড়ই সূক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োগ করা হয় বরং বলতে গেলে মূল ঔষধের একটি প্রচ্ছায়াই এতে অবশিষ্ট থাকে। তাই যে পরিমাণেই সেবন করা হোক না কেন, পরিমাণে কম বা বেশী সেবন করলে কিছু যায় আসে না। এর ব্যবধান এতই সামান্য যে, ৫০টি গ্লোবিউলস খেলেও যা কয়েকটি গ্লোবিউলস খেলেও তা বাস্তবে কোনো তফাত নেই। এমনিতে ঔষধ এতখানি নিতে হয় যা খুব কমও নয়, আবার অতিরিক্তও নয়। তবে কতবার ঔষধ সেবন করা হ'লো – এটা অবশ্যই বিবেচ্য বিষয়। ঔষধের ক্রিয়া মুখে দিতেই আরম্ভ হয়, পাকস্থলীর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। রক্ত-কণিকা মুখ থেকে

ঔষধের প্রভাব গ্রহণ করে এবং দেহের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। কিছু সংখ্যক হোমিও চিকিৎসক জোর দিয়ে থাকেন – হাতের পরিবর্তে ঔষধ কাগজে নিয়ে মুখে দিতে হবে, তা না' হলে ঔষধের গুণাগুণ নিঃশেষ হ'য়ে যাবে। অথচ, সাধারণতঃ মুখ-গহ্বরের চেয়ে হাত বেশী পরিষ্কার থাকে। মুখের ভেতর নানা ধরনের ময়লার স্তর জমে থাকে। এতদ্সত্ত্বেও সেটা যদি ঔষধের প্রভাব গ্রহণ করতে পারে তাহলে ঔষধ হাতে নিয়ে খেলে অসুবিধেটা কোথায়? কাগজে নিয়ে খেতে বল্লে প্রশ্ন জাগে, কাগজের উপরেও তো অনেক রকম ময়লা থাকে! লক্ষণীয় যে, সাধারণ খাবার লবণকে হোমিও পদ্ধতির ঔষধ বানালে নেট্রাম মিউর (NATRUM MUR) বলা হয়। মুখ গহ্বরে পূর্ব থেকেই এত লবণ বিদ্যমান যে, সেই মুখে নেট্রাম মিউর সেবনের অর্থ হ'লো লবণের খনিতে যেন কেউ এক ফোটা পানি ঢালছে! এতদ্সত্ত্বেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ হ'লো, হোমিও ঔষধের ক্রিয়া জাগতিক অণু-পরমাণুর সাথে সম্পৃক্ত নয়। ঔষধ প্রস্তুতকালে মূল ঔষধের এমন কোন স্মৃতি বা ছাপ রয়ে যায় যা রক্তে মিশে নিজের প্রভাব অবশ্যই প্রদর্শন করে। একটি দ্রবণে মূল ঔষধের একটি পরমাণুও বিদ্যমান নয় তথাপি এই দ্রবণ মূলের সব গুণাগুণের অধিকারী কীভাবে হয় – এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো দেয়া সম্ভব হয় নি! প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ্তাআলা চির অম্লান স্মরণশক্তির একটি ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করেছেন। এটা একটি আত্মিক ব্যবস্থাপনা, তবে জড় বস্তুর সাথে এর একটা সম্পর্ক বিদ্যমান।

হুযুর (আইঃ)-এর অভিজ্ঞতালব্ধ নিত্যপ্রয়োজনীয় ঔষধ

৬. যে শিশুরা স্কুলে যেতে ভয় পায় তাদের ফসফরাস (Phosphorus)+ একোনাইট (Aconite) +ওপিয়ম (Opium) সেবন করানো উচিত।

৭. যে সব শিশু বারবার কান্নাকাটির সুযোগ খুঁজে তাদেরকে ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া (Staphysagria) ব্যবহার করানো উচিত।

হোমিও ঔষধ কখন সেবন করা উচিত

ঔষধ সেবনে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। খাদ্য গ্রহণের আধা ঘন্টা পূর্বে এবং আধা ঘন্টা পরে– এ সময়ের মধ্যে যেন ঔষধ সেবন করা না হয়। এই সতর্কতামূলক বিরতির মধ্যে ঔষধ সেবন করলে ঔষধ কার্যকর হয় ঠিকই তবে ফলপ্রসূ কম হয়। কিন্তু জরুরী প্রয়োজনে এই সময়ের মাঝে খেলেও কোনো ক্ষতি নেই। ভোর বেলা খালি পেটে এবং রাতে ঔষধ সেবন করা অবশ্যই উত্তম।

ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী

হোমিও ঔষধ প্রস্তুত করার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমে ঔষধের মূল অংশকে এলকোহলে (রেকটিফাইড স্পিরিট-পরিশুদ্ধ সুরাসার) মিশিয়ে কিছু সময় রেখে তারপর একে ছেঁকে নেয়া হয়। এই প্রাথমিক অবস্থাকে পোটেন্সি বলা হয় না। এই মিশ্রণকে মাদারটিংচার (Mother Tincture) বলে। অনেক ব্যাধিতে মাদারটিংচারই ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, লিভারের ব্যাধিতে কার্ডুয়াস মেরিএনাস (Carduas Marianus) মাদারটিংচার রূপেই ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধকে অল্প পানিতে ৮/১০ ফোঁটা মিশিয়ে খাওয়ালে লিভার (যকৃত)-এর অনেক ব্যাধিতে উপকার লাভ হয়। যখনই কোনো হোমিও ঔষধের 'Q' অক্ষরটি লেখা দেখবেন, জানবেন, এটি মাদারটিংচার-এর চিহ্ন বিশেষ।

মাদারটিংচার থেকে হোমিও ঔষধ প্রস্তুত করার সাধারণ পদ্ধতিটি হলো, পানি বা এলকোহলের ১০০ ফোঁটা একটি শিশিতে ভরে নিন। মাদার টিংচারের কেবল এক ফোঁটা এতে ঢালুন। এরপর ছিপি বন্ধ করে জোরে দুইবার এমনভাবে ঝাঁকি দিন যেন এটি সমস্ত দ্রবণে ভালভাবে মিশে একাকার হয়ে যায়। এর দ্বারা যে ঔষধ প্রস্তুত হবে একে 'এক পোটেন্সি' বা এক শক্তিসম্পন্ন বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, একোনাইট মাদার টিংচারের এক ফোঁটা নিয়ে যদি ১০০ ফোঁটা দ্রবণের দু'চারটি শক্তিশালী ঝাঁকি দিয়ে মেশানো হয় তবে একে 'একোনাইট 1'বলা হবে। এই একোনাইট 1 এর শক্তি বৃদ্ধি করতে চাইলে এথেকে কেবল এক ফোঁটা ঔষধ ১০০ ফোঁটা দ্রবণের মধ্যে মিশিয়ে নিয়ে ভালভাবে ঝাঁকি দিন। এতে যে ঔষধ প্রস্তুত হবে তাকে একোনাইট (Aconite) 2 বলা হবে। একোনাইট 2 থেকে এক ফোঁটা ঔষধ একই প্রণালীতে অর্থাৎ একশ' ফোটা দ্রবণে মিশিয়ে নিলে একোনাইট 3 প্রস্তুত হবে। একইভাবে ৩০ বার এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখলে একোনাইট 30 প্রস্তুত হবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে হোমিও ঔষধ-পত্র ব্যবহার করে থাকি সেগুলো এই প্রক্রিয়ায় তৈরী করা হয়। এদের শক্তিমাত্রার পাশে 'C' অক্ষরটি লেখা হয় যার অর্থ ১০০। এর অর্থ হলো প্রত্যেক উচ্চতর পোটেন্সী পূর্ববর্তী পোটেন্সীর ১০০ ভাগের ১ভাগ। যদি দ্রবণ মিশ্রণের প্রতিটি ধাপে ১০০ ফোঁটা দ্রবণের পরিবর্তে কেবল ১০ (দশ) ফোঁটা দ্রবণের ১ ফোঁটা মাদারটিংচার ঢালেন– এর দ্বারা যে ঔষধ প্রস্তুত হবে একে 1X পোটেন্সী বলা হবে। এই 1X থেকে এক ফোঁটা ঔষধ নিয়ে যদি ১০ ফোঁটা দ্রবণের সাথে মেশানো হয় তাহলে তাকে 2X বলা হবে। যদি প্রতিটি ধাপে একই প্রণালী ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় তাহলে প্রতিবার ঔষধের শক্তি 1X বাড়বে। অর্থাৎ 1X থেকে 2X আবার 2X থেকে 3X, তারপর 3X থেকে 4X। সুতরাং প্রতিবারে ঔষধকে ১০ ফোঁটা দ্রবণে মেশাতে থাকলে এক এক করে শক্তি বাড়তে থাকবে। বায়োকেমিক ঔষধ এই প্রক্রিয়ায় এক ধরনের হালকা মিষ্টি থেকে প্রস্তুত করা হয় (যাকে বলা হয় সুগার অব মিল্ক)। যেমন ধরুন, মাদার টিংচারের এক ফোঁটা নিয়ে দশ গ্রাম 'মিষ্টিতে' খুব ভালভাবে পিশে একাকার করে দিলে এতে বায়োকেমিক ঔষধের 1X পোটেন্সী প্রস্তুত হবে। এর থেকে একগ্রাম মিষ্টি ঔষধ নিয়ে আরও দশ গ্রাম মিষ্টির সাথে খুব ভালভাবে পিশে মিশ্রিত করে নিলে 2X ঔষধ তৈরী হবে। এই 2X থেকে এক গ্রাম নিয়ে আরও দশ গ্রাম মিষ্টিতে যদি একই প্রক্রিয়ায় ভালভাবে মিশিয়ে একাকার করে দেন তাহলে এটা 3X পোটেন্সীর হয়ে যাবে।

অনুবাদ– **আবদুল আওয়াল খান চৌধুরী**

হাকীকাতুল ওহী

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

(৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

খোদার পক্ষ হইতে কোন যালেমের জন্য যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় উহা অবশেষে পূর্ণ হইয়া যায়

নিদর্শন নম্বর ২০৮ – এই দেশ পাঞ্জাবে যখন আর্য ধর্মের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ তাহার ধ্যান-ধারণা বিস্তার করিল এবং হীন প্রকৃতির হিন্দুদিগকে আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার ক্ষেত্রে ও তদ্রূপেই অন্যান্য নবীগণের অবমাননা করার ব্যাপারে তৎপর করিয়া দিল এবং নিজেও কলম ধরিয়াই তাহার পুস্তকাদিতে খোদার সকল পবিত্র ও সম্মানিত নবীগণকে যত্রতত্র তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবমাননা করিতে শুরু করিল এবং বিশেষভাবে তাহার পুস্তক 'সতীয়ারথ্ প্রকাশ'-এ অনেক মিথ্যার মল ব্যবহার করিল, এবং সম্মানিত পয়গম্বরগণকে জঘন্য গালি-গালাজ করিল তখন তাহার সম্পর্কে আমার নিকট ইল্হাম হইল যে, খোদাতাআলা এইরূপ ক্ষতিসাধনকারীকে অতি শীঘ্র পৃথিবী হইতে উঠাইয়া নিবেন। এই ইলহামও হইল– সা ইউহ্যামুল জামাউ ওয়া ইউআল্লুনাদ দুবুর অর্থাৎ ধর্মের পরিণতি এই হইবে যে, খোদা তাহাদিগকে পরাজিত করিবেন, অবশেষে তাহারা আর্য ধর্ম হইতে পলায়ন করিবে ও মুখ ফিরাইয়া নিবে অবশেষে (এই ধর্ম) অনস্তিত্বে পর্যবসিত হইয়া যাইবে। এই ইলহাম বহুদিন পূর্বের। প্রায় ৩০ (তিরিশ) বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ইহা সম্পর্কে এই স্থানের এক আর্যকে অর্থাৎ লালা শরমপতকে অবহিত করা হইয়াছিল। তাহাকে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছিল যে, তাহাদের অশ্লীলভাষী পণ্ডিত দয়ানন্দ এখন অতি শীঘ্র মারা যাইবে। বস্তুত: এক বৎসর না যাইতেই খোদাতাআলা তাঁহার ধর্মকে এই অশ্লীলভাষী পণ্ডিতের কবল হইতে মুক্ত করিলেন। সে আজমীরে মরিয়া গেল। শরমপতের জন্য ইহা একটি বড় নিদর্শন ছিল। কিন্তু সে এই নিদর্শনের কল্যাণ হইতে কেবল নিজেকে বঞ্চিতই রাখিল না, বরং আরো কয়েকটি সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখিয়াও দুর্ভাগ্যবশত: ইলহাম গ্রহণ করিল না। আমি আমার অন্য একটি পুস্তক 'কাদিয়ান কে আরিয়া আওর হাম'-এ এই সকল নিদর্শন লিখিয়াছি। এইগুলির সাক্ষী না কেবল শরমপত, বরং কাদিয়ানের আরো অনেক হিন্দুও এইগুলির চাক্ষুস সাক্ষী। আফসোস, এই সকল লোক এই নিদর্শনসমূহ হইতে কোন উপকার গ্রহণ করে নাই বরং ঔদ্ধত্য, চালাকী ও দুষ্টামীতে তাহারা আরো অনেক বেশী সম্মুখে অগ্রসর হইল। এমনকি সোমরাজ, আদ্দর মল ও ভগতরাম কাদিয়ানে একটি পত্রিকা বাহির করিল এবং উহার নাম রাখিল 'শুভ চিন্তক'। ইহাতে গালি দেওয়া ও কটু কথা বলাকে তাহারা নিজেদের কর্তব্য মনে করিল। কিন্তু খোদা দীর্ঘ দিন যাবৎ কয়েকবার আমাকে সংবাদ দিয়া রাখিয়াছিলেন যে, আর্য সমাজের আয়ূ এখন শেষ হইতে চলিয়াছে। বস্তুত: আমি আমার পুস্তক 'তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন' এর ৬৬ পৃষ্ঠায়, যাহা ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৩ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল, খোদাতাআলা হইতে ইলহাম পাইয়া নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাণী উহার ৬৬ পৃষ্ঠার ৭ ও ৮ লাইনে প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহা এই যে, "ঐ ধর্ম (অর্থাৎ আর্য ধর্ম) মৃত। ইহাকে ভয় করিও না। এখনও তোমাদের মধ্য হইতে লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি মানুষ জীবিত থাকিবে যাহারা এই আর্য ধর্মকে বিনাশ হইতে দেখিয়া নিবে।"

অনুরূপভাবে আমি আমার পুস্তক 'নাসীমে দাওয়াত' এর ৪ ও ৫ পৃষ্ঠায় আর্যদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম। ইহা আর্যদের মোকাবেলায় ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩ সালে লিখিয়াছিলাম। ভবিষ্যদ্বাণীটি এই যে, "এই সকল লোকের সমস্ত আবেগ-উত্তেজনা তাহারা কেবল জাতি ও সমাজের জন্য দেখাইয়া থাকে। খোদার মাহাত্ম্য ইহাদের হৃদয়ে নাই। কাদিয়ানের আর্যরা মনে করে যে, আমরা প্লেগের থাবা হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছি। কিন্তু এই কটু ভাষা ও বেয়াদবী কি এমনি এমনি যাইবে? শুন হে কাফেররা! আমার এবং আমার পূর্বে যে সকল ন্যায় ও সত্যপরায়ণ ব্যক্তি চলিয়া গিয়াছেন তাহাদের সকলের অভিজ্ঞতা এই যে, খোদার পবিত্র রসূলগণের সাথে বেয়াদবী করা ভাল নয়। খোদার নিকট প্রত্যেক পাপ ও ঔদ্ধত্যের শাস্তি আছে।"

অত:পর আমি আমার পুস্তক 'কাদিয়ান কে আরিয়া আওর হাম' যাহা ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয়, উহার ২১ ও ২২ পৃষ্ঠায় এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিয়াছিলাম। "এই সকল লোক, নবীগণকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করার ক্ষেত্রে সীমালংঘন করিয়াছে, যাঁহাদের সত্যবাদিতা সূর্যের ন্যায় চমকাইতেছে। খোদা স্বীয় বান্দাদের জন্য আত্মাভিমানী। তিনি নিশ্চয় ইহার ফয়সালা করিবেন। তিনি নিশ্চয় তাঁহার প্রিয় নবীগণের জন্য কোন হস্ত প্রদর্শন করিবেন।" এতদ্ব্যতীত আমি এই 'কাদিয়ান কে আরিয়া আওর হাম' পুস্তকেরই কবিতায় অর্থাৎ ৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি – "ইহাদের চোখে কোনো লজ্জা-শরম নাই। ইহারা সীমালংঘন করিয়াছে। ইহাই চূড়ান্ত পর্যায়। আমি ঐ ব্যক্তি, যাহাকে সর্বশক্তিমান খোদা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কিছু দেখাইবেন। তাঁহার নিকট ইহাই আমার প্রত্যাশা।" এই ভবিষ্যদ্বাণীর সার কথা ইহাই যে, খোদা এই সকল লোককে কোন হস্ত প্রদর্শন করিবেন। ইহা ছাড়া এই পুস্তকেরই টাইটেলের ২নং পৃষ্ঠায় এই কবিতা আছে – "আমার মালিক, তুমি নিজেই ইহাদিগকে বুঝাও। আকাশ হইতে আরো একটি নিদর্শন দেখাও।" এই দোয়ার সার কথা এই যে, নিদর্শন-স্বরূপ আর্যদের ওপর অন্য কোন বিপদ অবতীর্ণ কর।

এইগুলিই ভবিষ্যদ্বাণী যাহা আর্য সমাজীদের সম্পর্কে করা হইয়াছিল। অতএব একজন বুদ্ধিমান বুঝিতে পারে যে, এইগুলি কীরূপ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে এবং আর্য সমাজীদের অভিশপ্ত নক্ষত্র প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। বস্তুত: এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কাদিয়ানের আর্য সমাজীদের তেজোদীপ্ত সদস্যরা, যাহারা শুভ-চিন্তক পত্রিকা চালাইতেছিল, সকলেই প্লেগের একটি চড়েই ধ্বংস হইয়া গেল, যেভাবে 'নাসীমে দাওয়াত' পুস্তকে তাহাদের প্লেগে ধ্বংস হইয়া যাওয়ার ব্যাপারটি পাঁচ বৎসর পূর্বে বলা হইয়াছিল। অন্যান্য স্থানের আর্যরা পাঞ্জাবের আর্যদের মধ্যে যাহাকে প্রধান নেতা বলা হইত এবং যাহার শান-শওকতের দরুন আর্যরা ক্ষুব্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই নিজেদের বিদ্রোহাত্মক চিন্তা-চেতনার কারণে শাস্তিযোগ্য হইয়া গেল। কাউকে কাউকে এই সরকারের কাজ-কর্ম হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। আফসোস, এই সকল লোক ইংরেজ সরকারের হাজার হাজার দয়া দেখিয়াও নিমকহারামী করিল এবং বিদ্রোহাত্মক কথা দ্বারা ভয়ানক বজ্জাতী করিল। কিন্তু আজ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর পূর্বে ইহাদের বিনাশ ও ধ্বংস হওয়া

সম্পর্কে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল, ঐগুলি পূর্ণ হওয়ারই কথা ছিল। এখন নিশ্চিত জানিও যে, আর্যসমাজীরা শেষ হইয়া যাইবে। খোদা যেভাবে ওয়াদা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইল। মানুষের কি শক্তি আছে যে, নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে? অতএব ঐ খোদার হাজার হাজার শোকর এবং সকল প্রশংসা ও প্রতাপ তাহার জন্য যিনি ইসলামের সমর্থনে এইরূপ বড় বড় নিদর্শন প্রকাশ করেন। ওয়াস্‌সালামু আল মানিত্তাবাআল হুদা (অর্থঃ- যাহারা হেদায়াতের অনুসারী তাহাদের উপর শান্তি - অনুবাদক)।

আমি এই পর্যন্ত লিখিয়াছিলাম যে, আজ ১২ই মে, ১৯০৭ সাল, রোজ রবিবার এক ব্যক্তিকে কাশ্‌ফী (দিব্য-দর্শনে) অবস্থায় আমাকে দেখানো হইল। কিন্তু আমি তাহার চেহারা ভুলিয়া গিয়াছি। কেবল ইহা মনে রহিল যে, সে এক ভয়ানক দুশমন। সে তাহার বক্তৃতায় ও লেখায় গালি-গালাজ করে ও ভয়ানক অশ্লীল কথা বলে। ইহার পরে ইলহাম হইল, "মন্দের বদলে মন্দ। তাহার প্লেগ হইয়া গিয়াছে।" অর্থাৎ হইয়া যাইবে। অতএব আমি বিশ্বাস করি যে, শীঘ্র বা কিছু দেরীতে তোমরা শুনিবে এইরূপ কোন কঠোর দুশমন প্লেগের শিকার হইয়া যাইবে। যদি এইরূপ কোন কঠোর দুশমন যাহার সম্পর্কে তোমাদের হৃদয় বলিয়া উঠিবে যে, এই ব্যক্তি এই ইলহামের যোগ্য হইতে পারে, সে যদি প্লেগে আক্রান্ত না হয় তবে আমাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করার অধিকার তোমাদের থাকিবে। ইহার পরে আমাকে দেখানো হইল যে, দেশে অনেক গাফলতী, পাপ ও ঔদ্ধত্য ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা তাঁহার শক্তিশালী হস্ত প্রদর্শন না করিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা আমাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করা হইতে বিরত হইবে না। ইহার পরে ইলহাম হইল - "উহার পরিণতি হইবে ভয়ঙ্কর প্লেগ, যাহা দেশে বিস্তৃত হইবে। কয়েকটি নিদর্শন প্রকাশিত হইবে। কয়েকজন ভয়ানক দুশমনের গৃহ বিরান হইয়া যাইবে। তাহারা পৃথিবী ছাড়িয়া যাইবে। এই সকল শহরকে দেখিলে কান্না আসিবে। উহা কেয়ামতের দিন হইবে। পরাক্রমশালী নিদর্শনের সহিত উন্নতি হইবে। একটি ভয়াবহ নিদর্শন।" অর্থাৎ এইগুলির মধ্যে একটি ভয়াবহ নিদর্শন হইবে। সম্ভবত: উহাই ভূমিকম্প যাহার ওয়াদা আছে, বা আকাশ হইতে অন্য কোন নিদর্শন প্রকাশিত হইবে, বা প্লেগ কেয়ামতের নমুনা দেখাইবে। অত:পর খোদাতাআলা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আমার দয়া তোমার উপর বর্ষিত হইবে। আল্লাহ্ দয়া করিবেন। আমি এত নিদর্শন দেখাইব যে, তুমি দেখিতে দেখিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে"।

অত:পর ১৩ই মে, ১৯০৭ সাল, রোজ সোমবারে ইলহাম হইল, "আমি অচিরে তোমাকে দুশমনদের অনিষ্ট হইতে মুক্তি দিব। আমি তোমাকে তাহাদের উপর জয়যুক্ত করিয়া দিব। আমি তোমাকে এক আশ্চর্যজনক সম্মান দিব। প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল লোক যাহারা খোদাতাআলার পক্ষ হইতে আসে তাহাদিগকে কেবল খোদার নিদর্শনাবলী দ্বারা সনাক্ত করা হইয়া থাকে। যদি খোদা নিজের হাতে ফয়সালা না করেন তবে কেবল কথা দ্বারা কোন ফয়সালা হইতে পারে না।

সমাপ্ত

১৫ই মে, ১৯০৭ সাল।

ইসলামের আলেমগণের জন্য ঘোষণা

'ওয়া মান, আযলামু মিম্মানিফতারা আললাহি কাযিবান আও কায্‌যাবা বি আয়াতিহী' (সূরা আল্‌আন আম -আয়াত ২২)

(অর্থ:- এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে, যে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁহার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে? (অনুবাদক)।

সকলে অবগত আছে যে, আমি খোদাতাআলার নিকট হইতে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া আসিয়াছি এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপ ও তাঁহার সম্বোধন দ্বারা সম্মানিত হইয়াছি - আমার এই দাবী প্রায় ২৬ (ছাব্বিশ) বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। এই সময়ে আমার সেলসেলাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদী চেষ্টার কোন ত্রুটিই করে নাই এবং তাহারা আমাকে শাসকগণের নিকটও টানিয়া হেঁচড়াইয়া নিয়া গেল। এতদ্‌সত্ত্বেও আমি তাহাদের প্রতিটি হামলার সময় হেফাযতে রহিলাম। অবাক হইতে হয়, আমার মূলোৎপাটনের জন্য তাহাদের শত শত ব্যর্থতা সত্ত্বেও আজো তাহারা এই কথা বুঝিতে পারে নাই যে, আমার সাথে এক গোপন হস্ত আছে যাহা তাহাদের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করে। তাহারাতো আমাকে মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল ও খোদার নামে মিথ্যা বানোয়াটকারী বলে। কিন্তু তাহারা এই কথার জবাব দেয় না, পৃথিবীতে এইরূপ কোন মিথ্যাবাদী গত হইয়াছে, যাহাকে খোদা দুশমনদের ভয়াবহ হামলা হইতে ২৬ (ছাব্বিশ) বৎসর পর্যন্ত বাঁচাইয়া রাখেন। এমনকি তিনি তাঁহার বিশেষ ফযল দ্বারা তাহাকে শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ সময় পর্যন্ত নিরাপদ রাখেন, তাহাকে উন্নতির পর উন্নতি দান করেন এবং এক ব্যক্তি হইতে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে তাহার অনুবর্তী করিয়া দেন, এবং কোন দুশমনের উন্নতি হইল না এবং ভবিষ্যতেও উন্নতির কোন খবর নাই। পৃথিবীতে এইরূপ কোন মিথ্যাবাদী গত হইয়াছে, যাহার মোকাবেলায় প্রত্যেক মু'মিন মুবাহালার সময় মৃত্যু বা অন্য কোন ধ্বংসের দ্বারা আযাবের লক্ষ্যস্থল হইল। এইরূপ কোন মিথ্যাবাদী গত হইয়াছে, যাহার জন্য এবং যাহার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে রমযানে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হইল এবং পৃথিবীতে এক সর্বব্যাপী প্লেগ ছড়াইয়া পড়িল? অন্য কোন মাহদীর কি নিদর্শন পাওয়া যায়, যিনি চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের পনর বৎসর পূর্বে ইহা ঘটার খবর দিয়াছিলেন এবং প্লেগের ২৬ (ছাব্বিশ) বৎসর পূর্বে এবং তৎপর ১২ (বার) বৎসর পূর্বে এবং তৎপর তিন বৎসর পূর্বে দেশে ইহা ছড়াইয়া পড়ার ব্যাপারে ৩ (তিন) বার অবহিত করিয়াছিলেন?

এখন এই সময় আমার এই লেখার উদ্দেশ্য ইহাই যে, আমি আমার পুস্তক হাকীকাতুল ওহীতে আমার দাবী সম্পর্কে প্রত্যেক ধরনের যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছি। আমি এই সময়টিতে বিভিন্ন ধরনের শারিরীক পীড়া, ধারাবাহিক অসুস্থতা ও দুর্বলতার দরুন এতখানি কঠোর পরিশ্রম করার যোগ্য ছিলাম না। তদ্‌সত্ত্বেও আমি মানবজাতির প্রতি সহানুভূতির কারণে এই সকল পরিশ্রম করিয়াছি। এইজন্য আমি আমার প্রিয় জাতির বড় বড় আলেম ও মাশায়েখকে এবং ঐ সকল লোকদিগকে যাহারা এই পুস্তক পড়িতে পারেন, তাহাদের সকলকে খোদাতাআলার কসম দিতেছি যদি তাহাদের নিকট এই পুস্তক পৌঁছে তবে তাহারা যেন অবশ্য শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত এই পুস্তকটি মনোযোগের সহিত পড়িয়া নেয়। আবার আমি দ্বিতীয়বার তাহাদিগকে ঐ এক-অদ্বিতীয় খোদার কসম দিতেছি, যাহার হাতে প্রত্যেকের প্রাণ আছে, তাহারা যেন নিজেদের সময় ও কাজ-কর্মের ক্ষতি করিয়াও গভীর মনোযোগের সহিত একবার এই পুস্তকটি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়া নেয়। আবার আমি তৃতীয়বার ঐ আত্মাভিমানী খোদার কসম দিতেছি, যিনি ঐ ব্যক্তিকে পাকড়াও করেন, যে তাঁহার কসমের পরোয়া করে না, এইরূপ লোক যাহাদের নিকট এই পুস্তক পৌঁছে এবং যাহারা ইহা পড়িতে পারে, তাহারা মৌলবীই হউন বা মাশায়েখ হউন, তাহারা যেন অবশ্য এই পুস্তকটি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একবার পড়িয়া নেয়। ইনশাল্লাহ্ কাউকে

কাউকেতো আমি নিজেই এই পুস্তকটি পাঠাইয়া দিব এবং অন্যান্য কোন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি ওয়াদা করিতেছি, যদি তাহারা কসম খাইয়া লেখে যে, তাহাদের পক্ষে ইহার মূল্য পরিশোধ করার সামর্থ্য নাই তবে আমি সামর্থ্যহীনতার শর্ত সাপেক্ষে এবং পুস্তক মজুদ থাকার শর্তে তাহাদিগকে এই পুস্তক পাঠাইব যদি তাহারা খোদাতাআলার কসম খাইয়া আমাকে লেখেন যে, তাহারা এই পুস্তকের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িবেন। এতদ্ব্যতীত তাহারা আরো লিখিবেন যে, তাহারা দীনহীন ও তাহাদের মূল্য আদায়ের শক্তি নাই। যে ব্যক্তির নিকট এই পুস্তক পৌঁছিবে এবং সে খোদাতাআলার কসম সম্পর্কে বেপরোয়া হইয়া এবং খোদার কসমকে অসম্মানের দৃষ্টিতে দেখিয়া পুস্তকটির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত না পড়ে বা কিছু অংশ পড়িয়া ছাড়িয়া দেয় এবং তৎপর গালাগালি করা হইতে বিরত না হয়, আমি দোয়া করিতেছি যে, এইরূপ লোকদিগকে খোদা যেন ইহকালে ও পরকালে ধ্বংস ও লাঞ্ছিত করেন, আমীন।

কিন্তু যে ব্যক্তি এই পুস্তকের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িবে ও ভালভাবে বুঝিবে তাহার ব্যাপার খোদার সহিত হইবে। এখন আমি এই ঘোষণা শেষ করিতেছি। যাহারা হেদায়াতের অনুসরণ করে তাহাদের উপর শান্তি।

ঘোষণাকারী
মির্যা গোলাম আহমদ, মসীহ্ মাওউদ, কাদিয়ান

ইনকিলাবে হাকীকী
(প্রকৃত বিপ্লব)

মূল : হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ)

(২৬তম কিস্তি)

প্রকৃত বিপ্লব প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইলহামসমূহ :

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের ইলহামসমূহকে যদি দেখা যায় তাহলে ওগুলোর মধ্যে ঐ দাবী পাওয়া যায়। যেমন (১) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি কাশ্‌ফ (দিব্য-দর্শন) যার মধ্যে তিনি দেখেছেন যে, তিনি বলছেন–

"আমরা একটি নতুন ব্যবস্থাপনা এবং একটি নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী চাচ্ছি" (তাযকেরা ১৯৪ পৃষ্ঠা)।

চশমাহ্ মসীহি পুস্তকে তিনি এ কাশ্‌ফ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "এ কাশ্‌ফের উদ্দেশ্য ইহা ছিল যে, খোদা আমার হাতে এমন এক পরিবর্তন আনবেন যেন আকাশ ও পৃথিবী নতুন হয়ে যায় এবং সত্যিকারের মানুষ সৃষ্টি হয়" *(চশমাহ্ মসীহি : পৃষ্ঠা-৩৫, পাদটীকা)*।

(২) আবার ইলহাম রয়েছে –

"ইউহিদ্দীনা ওয়া ইউকীমুশ্‌শারী'আতা" (তাযকেরা পৃষ্ঠা-৬৯)।

অর্থাৎ মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ধর্মকে জীবিত করবেন এবং শরীয়তকে প্রতিষ্ঠা করবেন।

(৩) এভাবে আরও একটি ইলহাম আছে : "ওয়া'লামূ আন্নাল্লাহা ইউহ্‌ইল আরযা বা'দা মাওতিহা" (তাযকেরা, ৭৮ পৃষ্ঠা)।

অর্থাৎ মনে রাখো, ইসলামী দিক থেকে পৃথিবী মৃত হয়ে গেছে। আর এখন তিনি মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে এজন্যে প্রেরণ করেছেন যেন, তিনি উহাকে পুনরায় জীবিত করেন।

(৪) চতুর্থ ইলহাম বিরুদ্ধবাদীগণের প্রসঙ্গে রয়েছে,"জীন্দেগীকে ফেশন সে দূর যা পড়ে হ্যা, "ফা সাহ্‌হিকহুম তাসহীকা" *(তাযকেরা ৪৭২ পৃষ্ঠা)*। এ ইলহামে এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, লোকদের খেয়াল ফ্যাশনের দিকে। কিন্তু ঐ ফ্যাশন (চাল-চলন) যা জীবন সৃষ্টিকারী উহা থেকে দূরে সরে পড়েছে। এজন্য তাদেরকে পিষে ফেলা হবে এবং দোয়া শিখানো হয়েছে যে, বলো, হে খোদা! তুমি এসব লোকদের মিটিয়ে দাও এবং নূহ (আঃ)-এর যুগের ন্যায় ধ্বংস নিয়ে এস। যেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতার স্থলে দুনিয়াতে ইসলামী সংস্কৃতি ও ইসলামী সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৫) পঞ্চম ইলহাম হলো– "মা আনা ইল্লা কাল কুরআনি ওয়া সাইয়ায্‌হারু 'আলা ইয়াদাইয়া মা যাহারা মিনাল কুরআন" (তাযকেরা পৃষ্ঠা-৬১৭)। অর্থাৎ হে মসীহ্ মাওউদ! তুমি লোকদেরকে বলে দাও যে, আমি তো কুরআনের ন্যায়। যেভাবে কুরআন প্রাথমিক যুগে পরিবর্তন সাধন করেছিলো ওরকম পরিবর্তনই আমার যুগে সাধিত হবে।

(৬) ষষ্ঠ ইলহাম হচ্ছে– "আসমানী বাদশাহাত" (তাযকেরা ৬২২ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ খোদার রাজত্ব দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

এসব নিদর্শন ও ইলহাম দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য এই যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারাকে মিটিয়ে দিয়ে ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস, ইহার শরীয়ত, ইহার সংস্কৃতি, ইহার সভ্যতা, ইহার জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইহার অর্থনীতি, ইহার রাজনীতি, ইহার সামাজিকতা, ইহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ঐ পরিবর্তনের কিছু অংশ ব্যক্তিগত যেমন, নামায পড়া বা রোযা রাখা আর কিছু হলো জাতিগত। ব্যক্তিগত অংশ তো বক্তৃতা-নসীহত ও ব্যক্তিগত চেষ্টা-প্রচেষ্টানির্ভর অর্থাৎ লোকদের বলা হয় যে, তারা যেন নামায পড়ে, তারা যেন রোযা রাখে, তারা যেন হজ্জ করে, তারা যেন সদকা-খয়রাত দেয়, আবার যেসব লোক এ ওয়াজ-নসীহত দ্বারা প্রভাবিত হয় তারা নিজ নিজ পরিমণ্ডলে সৎকর্ম করতে লেগে যায়। কিন্তু জাতিগত বিষয়টা একটি শক্তিশালী ব্যবস্থাপনানির্ভর যেমন, যদি আমরা নিজেরা নামাযী হই তাহলে ইহা আবশ্যকীয় নয় যে, অন্যান্য সবাইও নামাযী হয়। যদি অন্য কেউ নামায না পড়ে তাহলে আমাদের নিজেদের নামায নিজেদের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু কতক আদেশ-নিষেধ এমন যা কিনা ব্যবস্থাপনানির্ভর হয়ে থাকে। আর আমরা ঐ সময় পর্যন্ত সাধন করতে পারি না যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যরাও ঐ কাজ না করে। যেভাবে নামায রয়েছে ইহা আমরা এককভাবে পড়তে পারি। কিন্তু বা-জামাত নামায আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পড়তে পারি না যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য ব্যক্তিরা আমাদের সাথে না আসে। অতএব নামায বা-জামাত একটি ব্যবস্থাপনার মুখাপেক্ষী অর্থাৎ ইহার জন্যে প্রয়োজন যে, একজন ইমাম হোক আর তার পিছনে একজন বা একের অধিক মুক্তাদী হোক। অন্যান্য অজস্র রকমের এমন আদেশ-নিষেধ রয়েছে যা কিনা একটি শক্তিশালী ব্যবস্থাপনার মুখাপেক্ষী, এমন একটি ব্যবস্থাপনা, যা অস্বীকার করার কোন প্রকার সুযোগ নেই।

(অবশিষ্টাংশ ১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

খতমে নবুওয়ত ও আহমদীয়া জামাত

মূল ঃ আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নযীর লায়েলপুরী

(দ্বাদশ কিস্তি)

ষোড়শ প্রশ্ন

দজ্জাল সংক্রান্ত রেওয়ায়াতগুলি মওদুদী সাহেবের মতে সন্দেহজনক হওয়া সত্ত্বেও তিনি **রাজনৈতিক কোন্ উদ্দেশ্যে** এগুলিকে উদ্ধৃত করিয়াছেন? কেননা, ধর্মের দিক হইতে তো তাঁহার কথামত ইহাদিগকে উদ্ধৃত ও বর্ণনা করিতে যাওয়া ইসলামের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক নহে এবং হাদীসের সঠিক জ্ঞানেরও পরিচায়ক নহে।

সপ্তদশ প্রশ্ন

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লামকে যখন বলা হয় নাই যে, দজ্জাল কখন জাহের হইবে, কোথায় জাহের হইবে, তখন মওদুদী সাহেব কেন তাঁহার 'খমতে নবুওয়াত' পুস্তিকায় এ সম্বন্ধে এই প্রকার বিশ্বাস জন্মাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, দজ্জাল বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রে ফেলিস্তিনের ইহুদীদের মধ্য হইতে মসীহ্ মাওউদ দাবী করিয়া দাঁড়াইবে, তাহার পর দামেশ্কের দিকে যাত্রা করিবে? অথচ তামীম দারীর রেওয়ায়াত শুনিয়া আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওসাল্লাম দজ্জাল সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, 'দজ্জাল পূর্ব দিক হইতে বাহির হইবে' এবং দামেশ্ক মদীনা মুনাওয়ারার পূর্ব দিক নহে!

মওদুদী সাহেব দজ্জাল এবং মসীহ্ ইব্নে মরিয়মের নযূল সংক্রান্ত আ হাদীস বর্ণিত "ইয়াক্সিরুস্ সলীব" "ক্রুশ ভাঙ্গিবেন" বাক্যকে জাহেরী ও বাহ্যিক অর্থে না নিয়া তাঁহার পুস্তিকায় 'তা'বীর' (ব্যাখ্যা) করিয়াছেন ঃ-

"একটি পৃথক ধর্ম হিসেবে ঈসায়ী ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।" ['খতমে-নবুওয়াত,' বাঙলা সংস্করণ, ৪৬ পৃঃ পাদ-টীকা]

তাহার পর হাদীসোক্ত "ইয়াকতুলুল্ খিন্যির (শূকর বধ করিবেন) বাক্যের জাহেরী অর্থ ছাড়িয়া 'তা'বীর' করিয়াছেন ঃ-

"অনুরূপভাবে তিনি (অর্থাৎ হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালাম) বলবেন, আমার অনুসারীদের জন্যে আমি শূকর হালাল করিনি এবং তাদেরকে শরীয়তের বিধি-নিষেধ থেকে মুক্তিও দেইনি, তখন ঈসায়ী ধর্মের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যও নির্মূল হয়ে যাবে" *['খতমে নবুওয়াত', বাঙলা সংস্করণ, ৪৭ পৃঃ পাদ-টীকা]*।

অর্থাৎ, এই হিসাবে 'ক্রুশ ভাঙ্গা' জাহেরীভাবে হইবে না এবং মসীহ্ মাওউদ জাহেরীভাবে শূকর বধ করিবেন না, বরং খৃষ্টানদিগকে শূকর মাংস খাওয়ার জন্য বধ করিতে নিষেধ করিবেন বলিয়া 'তাবীর' করা হইয়াছে। অন্য কথায়, মওদুদী সাহেব উল্লেখিত বাক্যগুলি রূপক অর্থে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন।

অষ্টাদশ প্রশ্ন

সুতরাং, এখন এই প্রশ্ন জন্মে যে, হাদীসের একাংশকে মওদুদী সাহেব যখন রূপকভাবে বর্ণিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তখন অপরাংশ অর্থাৎ হযরত ঈসা ইব্নে মরিয়ম আলায়হেস্ সালাম ফিরিশ্তাদের কাঁধের উপর ভর রাখিয়া দামেশ্কের মিনারার পার্শ্বে (আকাশ হইতে) অবতরণ এবং দজ্জাল্কে অস্ত্রাঘাতে হত্যা করিবার হাদীস বর্ণিত বিষয়কে **'এক জন মসীলে মসীহের আসমানী সাহায্যে আগমন'** এবং **'যুক্তির অস্ত্রে দাজ্জালী আন্দোলনের বিলোপ সাধন'** অর্থে বিশ্বাস করিতে বাধা কোথায়?

বিশেষ দ্রষ্টব্য

মওদুদী সাহেব বলেন :

"মসিহ্ জীবিত থাকা এবং আকাশের দিকে উত্তোলন নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় না। কোরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা একীন পয়দা হয় না" *[মওদুদী সাহেবের বক্তৃতা, আছরা, ২৮শে মার্চ, ১৯৫১ সন, আয়নায়ে মওদুদীয়ত' হইতে সঙ্কলিত]*।

আবার তিনি বলিয়াছেন :

"মসিহ্ আলাইহেস্ সালামের উত্তোলন ('রাফা' হওয়ার) বিষয় 'মুতাশাবেহাতের' অন্তর্গত" *['কওসর' পত্রিকা, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ইং]*।

ইহা সত্ত্বেও মওদুদী সাহেব তাঁহার 'খতমে নবুওয়াত' পুস্তিকায় 'মসীহের নযূল' সম্বন্ধে যে সকল হাদীস উপস্থিত করিয়াছেন, তদ্বারা হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালামের আকাশ হইতে সোজাসুজি নাযেল হওয়া সম্বন্ধে প্রত্যয় জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অথচ আ হাদীস সম্বন্ধে তাঁহার 'মযহব' (মত) এই ঃ

"কোরআন করীমের আয়াত আল্লাহ্তা'লার তরফ হইতে নাযেল হওয়া সম্বন্ধে কাহারো কোনও সন্দেহ করিবার স্থান নাই। তৎ-বিপরীত রেওয়ায়াত সম্বন্ধে এই সন্দেহের অবকাশ আছে যে, বাস্তবিকই হুজুরের, কি হুজুরের নয়?" *['রাসায়েল ও মাসায়েল', ২৭ পৃঃ]*

উনবিংশতি প্রশ্ন

এখন প্রশ্ন, মওদুদী সাহেব কেন তাঁহার উপরোক্ত ধারণার বিরুদ্ধে 'মসীহের নযূল সংক্রান্ত আ হাদীস' দ্বারা হযরত ঈসা আলায়হেস সালাম সোজা আসমান হইতে নাযিল হইবেন বলিয়া জনসাধারণের প্রত্যয় জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছেন, যখন তিনি কুরআন মজীদের পরিপ্রেক্ষিতে ঈসা আলায়হেস সালাম জীবিতাবস্থায় আকাশে উত্তোলিত হওয়াকে সুনিশ্চিত বলিয়া জানেন না এবং রেওয়ায়াতগুলিকে কুরআন মজীদের সহিত তুলনাপূর্বক বলেন যে, "এই সন্দেহের অবকাশ আছে" যে, ঐগুলি সত্যই আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওসাল্লাম হইতেই বর্ণিত হইয়াছে কি না?

আরো কথা

মওদুদী সাহেব ইমাম মাহ্দী আলায়হেস্ সালাম সম্বন্ধীয় একটি হাদীসের সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন ঃ

"মূল সত্যকে সম্পূর্ণ আবরণশূন্য করিয়া দেওয়া যাহার ফলে বুদ্ধির পরীক্ষার কোনই সুযোগ থাকে না, **খোদাতাআলার হিকমতের খেলাফ**। কীরূপে ধারণা করা যায় যে, আল্লাহ্তাআলা এই বিধানকে শুধু ইমাম মাহ্দীর বেলায়ই পরিবর্তন করিবেন এবং তাঁহার বায়আতের সময় আকাশ হইতে ঘোষণা করিবেন যে, হে মানবগণ! ইনি 'আমার খলিফা মাহ্দী। তাঁহার কথা শুন এবং পালন কর' *['তর্জমানুল্-কুরআন,' জুন, সন ১৯৪৬]*।

বিংশতি প্রশ্ন

তবে কেন মওদুদী সাহেব হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালাম ফিরিশ্তাদের পাখায় হাত রাখিয়া দামেশ্কের পূর্ব দিকস্থ শ্বেত মিনারার পার্শ্বে জাহেরীভাবে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছেন? ইহা কি, আল্লাহ্তাআলার চিরাচরিত প্রথা ও ঐশী হিকমতের বিরোধী নয়? ইহাতে কি "হাকীকত"

মাহদী সম্বন্ধে আকাশ হইতে শব্দ হওয়ার চেয়েও অধিক আবরণ মুক্ত হইয়া পড়ে না এবং বুদ্ধির পরীক্ষার সুযোগ নষ্ট হয় না?

তাহার পর

মওদুদী সাহেব 'খতমে-নবুওয়াত' পুস্তিকায় একথা বিশ্বাস করাইতে চাহেন যে, মসীহ্ আলায়হেস্ সালাম নাযিল হওয়া মাত্র মুসলমান এবং খৃষ্টান সকলেই তাঁহাকে গ্রহণ করিবে। তিনি লিখিয়াছেনঃ-

"তখন সমস্ত ধর্মের বৈষম্য ঘুচিয়ে মানুষ একমাত্র দীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর ফলে (মূল উর্দূতে আছে এই প্রকারে) আর যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না এবং কারুর থেকে জিজিয়াও আদায় করা হবে না" *['খতমে নবুওয়াত', বাঙলা সংস্করণ, ৪ পৃঃ, পাদ-টীকা]*।

একবিংশতি প্রশ্ন

ইহাতে প্রশ্ন জাগে, হযরত আদম আলায়হেস সালামের সময় হইতে নিয়া আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত কোন নবীর সময়ই কি এমন হইয়াছে যে, কোন নবী দাবী করা মাত্র বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া তাঁহার সম-সাময়িক সমস্ত মানুষ তাঁহাকে এক মুহূর্তে কবুল করিয়াছে? এই প্রকার বিশ্বাসের ফলে গৃহীত হওয়ার দিক দিয়া হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালামের কি এমন মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয় না, যাহা কোন নবী লাভ করেন নাই? এমন কি, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামেরও (নাউযুবিল্লাহ্) এই মাহাত্ম্য ছিল না যে, তাঁহার জাতি কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ না করিয়াই তাঁহাকে গ্রহণ করে।

মওদুদী সাহেবের নীতি-ভঙ্গ

সুতরাং, দজ্জাল ও মসীহ্ নাযেল সংক্রান্ত মওদুদী সাহেবের 'মন্তব্যগুলি তাঁহার স্বীকৃত নীতি ও ধারণার – তাঁহার মাস্‌লিক মুসাল্লামতের' বিরোধী এবং তাহার নীতি পরিহারে জ্বলন্ত প্রমাণ।

হাদীস সম্বন্ধে আমাদের নীতি

ভবিষ্যৎ সক্রান্ত হাদীসগুলি সম্বন্ধে আমাদের অনুসৃত কোন প্রকার নীতি-বর্জন দোষে দুষিত নহে। ভবিষ্যৎ বিষয় সংক্রান্ত হাদীসগুলির গুপ্ত অহী সম্বলিত, অর্থাৎ মুকাশাফাতের সহিত সম্পর্কিত। এজন্য 'মুকাশাফাত' (অতি জাগ্রত অবস্থায় আধ্যাত্মিক দৃশ্যাবলী দর্শন) এবং 'রুইয়া সালেহা' (সত্য-স্বপ্নের) ন্যায় এই প্রকার হাদীসগুলির 'তা'বীর' (বা তাৎপর্য গ্রহণ) করিতে হয়। আমরা ইহাদের এমন 'তা'বীর' করি, যাহাতে বুদ্ধি পরীক্ষার অবকাশ থাকে এবং 'ইয়ূমেনূনা -বিল-গায়েব' (অদৃশ্য বিষয়ে ঈমান আনার) সওয়াব অন্তর্হিত হইয়া না যায় এবং আল্লাহ্‌র নিয়ম ও হেকমত বজায় থাকে। যদি কোন স্থানে দুই বা ততোধিক হাদীস বাহ্যতঃ অনৈক্যপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করিতেছে বলিয়া দেখায়, সেখানে আমরা উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করি। যদি এই প্রকার হাদীসগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা না যায়, তবে আমরা যাহা সর্বপেক্ষা কল্যাণকর উহাকে উপরে স্থান দেই। ভবিষ্যৎ বিষয় সংক্রান্ত হাদীসগুলি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়সাল্লাম হইতে আহরিত হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত হওয়ার কারণে আমরা কখনো সেগুলির অমর্যাদা পসন্দ করি না, যেরূপ মওদুদী সাহেব 'কানা দাজ্জালের' বিষয় সম্পর্কিত আ হাদীসকে 'গল্প-গুজব' বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইহা স্পষ্ট অমর্যাদা– ইস্তেখ্‌ফাফ। মওদুদী সাহেব তো "হাযা খলীফাতুল্লাহিল মাহ্‌দী "এই তো আল্লাহ্‌র খলীফা মাহদী") যে হাদীসে আছে, উহাকে রদ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা উহাকে সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীস বলিয়া জানি। কারণ আহ্‌মদীগণের মতে ইমাম মাহদী সম্বন্ধে রমযান মাসে আকাশে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের যে নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এক প্রকার আসমানী আওয়ায বা আকাশের ধ্বনিই ছিল এবং ইহা এই ঘোষণা করিতেছিল যে, "খোদাতাআলার খলীফা মাহ্‌দী আগমন করিয়াছেন। তাঁহার কথা শুন ও পালন কর"। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মওদুদী সাহেবের আধ্যাত্মিক শ্রবণেন্দ্রীয় ইহা শোনা হইতে বঞ্চিত। ইহা ছাড়া, অনেক আহ্‌মদী এলহামীভাবে জ্ঞান প্রাপ্ত হন যে, 'ইমাম আখেরুয্ যমান জাহের হইয়াছেন'। ইহাও 'আসমানী আওয়ায' বা 'আকাশ ধ্বনি' –যাহা তাঁহারা হৃদয়ের গভীরতম অংশে শ্রবণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে 'দজ্জাল জাহের হওয়া' এবং 'মসীহ্ ইব্‌নে মরিয়মের নযূল' সংক্রান্ত হাদীসসমূহের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির 'তা'বীর' করাও সমীচীন মনে করি। (ক্রমশ:)

অনুবাদ –এ.এইচ. এম. আলী আনোয়ার (মরহুম)

ইনকিলাবে হাকীকী

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে জামাতে আহমদীয়ার বিজয়!

বর্তমানে আমাদের জামাত, যেভাবে সুপ্রকাশিত ও প্রমাণিত, ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মহান বিজয় লাভ করেছে। আর আমাদের এ বিজয় শত্রু কর্তৃকও স্বীকৃত। যেমন, দেখে নাও, হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস্ সালাম যখন বল্লেন যে, মসীহ্ নাসেরী মারা গেছেন তখন সব গয়ের আহমদী এক বাক্যে বলে উঠলো যে, ইহা কুফরী। তাই এর ভিত্তিতে তারা তাঁর ওপরে কুফরীর ফতোয়া আরোপ করলো এবং ইহা বল্লো যে, তিনি মসীহের অপমান করেছেন। কিন্তু আজ দুনিয়ার দিকে দৃষ্টি ফিরাও দেখবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক লোক এমন আছেন যারা তাকে এখন মৃতই মনে করেন। এবং যদি এমন কাউকে দেখা যায়, যে কিনা মুখে তো স্বীকার করেন না কিন্তু অবশ্যই বলবেন যে, মসীহ্ জীবিত থাকুক বা মৃত তাকে আমাদের কী যায় আসে? ইহা কি এমন একটা জরুরী বিষয় যে, আমরা এর পেছন পড়ে থাকবো? এ পরিবর্তন বলে দিচ্ছে যে, শত্রুও স্বীকার করে যে, এখন এ অস্ত্র দ্বারা তারা আমাদের সাথে লড়তে পারছে না। পুনরায় দেখো, হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সাল্লামের ওপরে যে কুফরী ফতোয়া আরোপিত হয়েছে এর মধ্যে কুফরী ফতোয়ার একটি কারণ ইহাও স্বীকার করা হয়েছিল যে, তিনি কুরআন মজীদে নাসেখ মনসুখের অস্বীকারকারী। বিগত যুগের আলেমগণের মধ্যে কতক তো এগার শ' আয়াতকে মনসুখ (রহিত) নির্ধারিত করেছিলেন, কতক ছয় শ' আয়াত মনসুখ মনে করতেন। আর কতক এর চেয়ে কম আয়াত মনসুখ বলতেন। এমন কি যে, তিনটি আয়াতের নাসেখের স্বীকারকারী তো তারাও ছিলো যারা নাসেখের আইনানুগত্যতাকে ক্ষতিকর মনে করতো। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেছেন, এসব অনর্থক ও বাজে কথা। সমগ্র কুরআনই পালনীয়। আবার যেসব আয়াতের ওপরে আপত্তি করা হতো এবং বলা হতো যে, এগুলো মনসুখ, তিনি এগুলোর এমন আশ্চর্যজনক তত্ত্বসম্বলিত ব্যাখ্যা প্রদান করতেন তাতে ধারণা হতে লাগলো যে, কুরআনের আসল আয়াতই তো এগুলো ছিল। আর এমন গুপ্ত-ভাণ্ডার তাথেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাম বের করে রেখে দিতেন যে, বিশ্ব আশ্চর্যান্বিত হয়ে যেত যে, তখন পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিতে কেন ইহা লুক্কায়িত ছিলো। কিন্তু ঐ সময়ে যখন তিনি এসব কথা বলেন তখন তাঁর ওপরে কুফরীর ফতোয়া আরোপিত হলো। তাঁকে মন্দ বলা হলো এবং তাঁর বিরুদ্ধে লোকদেরকে উত্তেজিত করা হলো। যদিও ইহা এমন একটি সূক্ষ্ম বিষয় ছিলো যে, যদি দুনিয়ার কোন বুদ্ধিমান জাতির নিকট ইহা উপস্থাপন করা হতো তাহলে তাদের ওপরে আনন্দের ঢেউ খেলে যেত। কিন্তু আজ যাও এবং দেখ মুসলমানদের অবস্থা কী, নিরানব্বইজন মৌলভী বলেন যে, কুরআনের কোন আয়াত মনসুখ নয়। আর ঐসব আয়াত যেগুলোকে পূর্বে মনসুখে বলা হতো এখন কার্যকরী বলা হয় এবং উহাদের ঐ অর্থই করা হয় যা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হে সালাম করতেন। (চলবে)

অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

আমানতের সংরক্ষণ

[সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা তাং ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ইং মসজিদে ফযল, লন্ডন]

তাশাহ্হুদ, তাআউয ও সূরা ফাতিহার পর সূরা মাআরেজের আয়াত নং ৩৩-৩৬ পাঠ করে খুতবা এরশাদ করেন।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿٣٣﴾
وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ﴿٣٤﴾
وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٣٥﴾
اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

অনুবাদ ঃ এবং তাহারা (ব্যতিরেকে) যাহারা তাহাদের (নিকট গচ্ছিত) আমানত-সমূহ এবং অঙ্গীকার সম্বন্ধে যত্নবান এবং তাহারা (ব্যতিরেকে) যাহারা নিজেদের সাক্ষ্যসমূহের উপর কায়েম থাকে এবং তাহারা (ব্যতিরেকে) যাহারা তাহাদের নামাযের হেফাযত করে। ইহারাই জান্নাতসমূহে সম্মানের সহিত থাকিবে (সূরা আল্ মাআরেজ ৩৩-৩৬)।

আজকেও ঐ একই বিষয়, যা গত জুমুআয় হামবুর্গের (জার্মানী) খুতবার বিষয় ছিল। সময়ের অভাবে আমি বলেছিলাম, আগামী শুক্রবার লন্ডন থেকে এ বিষয়ে খুতবা প্রদান করব ইনশাআল্লাহ্। **আমানতের বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষের রূহানী (আধ্যাত্মিক) জীবনের প্রাণকেন্দ্র এরই মাঝে বিদ্যমান।**

আজকে এ বিষয়ে আরও কিছু হাদীস পড়তে চাই যা গত খুতবায় পড়া হয়নি। এগুলোর মধ্যে নতুন বিষয় আছে। প্রথমে এই আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করছি।

"ওয়াল্লাযিনাহুম লি আমানা তিহিম ওয়া আহ্ দিহিম রাউন" – এবং তারা যারা নিজেদের আমানতসমূহ,এবং অঙ্গীকারসমূহ সম্বন্ধে যত্নবান। 'রাউন' অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ বা দেখাশুনা করা। যেমন, রাখাল তার ছাগল, গরু, ভেড়া দেখাশুনা করে। এবং যারা প্রকৃত মু'মিন তারা নিজেদের আমানত এবং প্রতিজ্ঞাসমূহের উপর সর্বদা দৃষ্টি রাখেন। রাখালের দৃষ্টি যদি শিথিল হয়ে পড়ে তবে গরু-ছাগল সীমানার বাইরে চলে যাবে এবং বিপদের মধ্যে পতিত হবে। অতি চমৎকার বর্ণনা ! যারা সত্যিকার মু'মিন তারা নিজেদের আমানত-সমূহ এবং অঙ্গীকারসমূহের উপর সর্বদা দৃষ্টি রাখেন যে, এসব বিষয়গুলো এলোমেলো হয়ে বা এদিক-ওদিক যেন না হয়ে যায় এবং তারা নিজেদের সাক্ষ্যসমূহের উপর কায়েম থাকে।"

"সাক্ষ্যসমূহের উপর দৃঢ় বা অটল থাকার অর্থ কী হতে পারে ?" এর অর্থ এক বা একাধিক হতে পারে। প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তি নিজ সাক্ষ্যের উপর কায়েম বা অনড় থাকবে, যার সাক্ষ্য সত্য সাক্ষ্য হবে। যাদের সাক্ষ্য সত্য সাক্ষ্য হয় না, তারা নিজ বক্তব্য পরিবর্তন করতে থাকে। "যারা নিজ সাক্ষ্যের উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম" অর্থাৎ তারা কেবল ঐ কথার সাক্ষ্য প্রদান করেন যার উপর সর্বদা অবিচল থাকে। যখনই জিজ্ঞাসা করা হবে তারা ঐ একই উত্তর প্রদান করবে যে, কথার উপর তারা সাক্ষী থাকে।

"আলা শাহাদাতিহীম ক্বয়েমুন" (সাক্ষ্যসমূহের উপর কায়েম)- যা তারা স্বচক্ষে দেখে কেবল তাই-ই বর্ণনা করে থাকে। যার উপর তারা সন্দেহাতীতভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে। যারা শোনা কথা বলে, তারা কখনও এমন কথায় অটল থাকতে পারে না। অতঃপর যখন তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তারপর মানুষের ভয়ে নিজ বর্ণনাকে পরিবর্তন করে না। অনেক মানুষ সত্য সাক্ষ্যকে মানুষের ভয়ে পরিবর্তন করে ফেলে। আর একবার যখন বর্ণনা পরিবর্তন করে তখন আর তার কথার কোন মূল্য থাকে না।

আজ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সাথে যা ঘটেছে তা এই বক্তব্য পরিবর্তন করার ঘটনা। যখন বর্ণনা পরিবর্তন করা হয় তখন পূর্বের বর্ণনার উপরও আর আস্থা রাখা যায় না। পরের বর্ণনার উপরও কোন ভরসা করা যায় না। আমেরিকার আদালত এখন এই দো-টানার মধ্যে পতিত হয়েছে। যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল তাদের প্রথম বর্ণনা ঠিক ছিল কিংবা পরের বর্ণনা ঠিক। সত্য সাক্ষ্য দেবার ব্যাপারে কসম খাওয়ার পরে মহিলা বা মহিলারা যে সাক্ষ্য ব্যক্ত করেছিল এবং এখন আবার বলেছে যে, প্রথম বর্ণনা সত্য ছিল না, এবারের বর্ণনা সত্য। এখন কসম খেয়েও যদি বলে প্রথমবারের সাক্ষ্য সত্য ছিল না, এবারের সাক্ষ্য সত্য। তবুও কোন কথার উপর বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। সে দেশের বিচার বিভাগ (আদালত) - আজ এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। আর এই একই অবস্থা প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনেরও। তিনি কসম খেয়ে বলেছেন, আমি প্রথমে যা বলেছিলাম, তার মধ্যে কিছু কথা আমি গোপন রেখেছিলাম কিন্তু পরিষ্কার করে বলেন না যে, কি কথা গোপন করেছিলেন। দেখুন, কুরআনের শিক্ষাকে অবহেলা করে মানুষের কত অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হত হয়! যে শিক্ষা আপামর জনসাধারণের জন্য, সকলের জন্য সমান। এখানে মু'মিনদের গুণাবলী, যা বর্ণনা করা হয়েছে এর অর্থ এই নয় যে, গয়ের মু'মিনদের জন্য এটা কল্যাণজনক হবে না। মু'মিনদেরকে মানব জাতির মধ্যে নমুনা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। যদি কেউ নমুনা বা উদাহরণ গ্রহণ করতে চাও, যদি কেউ আমানতের দায়িত্বভার সুষ্ঠুভাবে আদায় করতে চাও, যদি নিজ অঙ্গীকারকে পূর্ণতা দিতে চাও তবে মু'মিনদের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ কর।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুগত দাসদেরকে এখানে মানব জাতির জন্য আদর্শ বা দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে।

"ওয়াল্লাযীনা হুম আলা সালাওয়াতিহীম ইউহাফিযুন।" অর্থাৎ, এবং তারা যারা নিজেদের নামাযের হেফাযত করে, যারা নামাযের মান রক্ষা করে। অঙ্গীকার পালনের সাথে নামাযের মান রক্ষার কী সম্পর্ক থাকতে পারে ? প্রকৃতঘটনা এই যে, তাদের প্রথম অঙ্গীকার আল্লাহ্‌র সাথে হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র অধিকার আদায় করার নিমিত্তে এবং তার আমানতের প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে তারা নামাযের মর্যাদা রক্ষা করে। আর নামায তাদের চরিত্র রক্ষা করতে থাকে।

এখানে "ইউহাফিযুন" – শব্দের গঠন প্রণালী এমন যেখানে উভয় পক্ষই সক্রিয় ভূমিকা রাখে। তারা নামাযকে রক্ষা করে (নামায সুন্দরভাবে আদায় করে) নামাযও তাদের রক্ষা করে। আর প্রকৃত ঘটনা এই যে, **যে ব্যক্তি যতদূর নামাযের হেফাযত করবে, তার নামাযও ততদূর তার হেফাযত করবে।**

"উলায়েকা ফি জান্নাতিম্ মুকরামূন" – অর্থাৎ ইহারা জান্নাতসমূহে সম্মানের সহিত অবস্থান করিবে। কুরআনের সাহিত্যে এ-ও একটি সুন্দর দিক যে, 'উলায়েকা' দ্বারা যে-সকল লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে বলে বিশেষভাবে তাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে। যদিও আয়াতের শেষে মুকরামূন"ও বলা হয়েছে (সম্মানী লোক)। আরো বলা হয়েছে যে, "এরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।" –অথচ অন্যান্য আয়াতে আরো অনেক দুর্বল মানুষেরও জান্নাতে প্রবেশ করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যাদের অনেক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু এখানে জান্নাতের সাথে শর্ত আছে "মুকরামূন" সসম্মানে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাত তো আর 'মুকরাম'–নয় বরং ঐ জান্নাতিদের কারণে জান্নাতও 'মুকরাম' –(সম্মানিত) হয়ে যাবে। যে স্থানে সম্মানিত মানুষ অবস্থান করেন, সে স্থানও তো সম্মানিত হয়ে যায়। ঘর ঘরের বাসিন্দাদের কারণে সম্মানিত হয়ে যায়। এই দিক থেকে উভয় অর্থ জায়েয মনে করছি। এইসব লোকদের বড় সম্মানের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। সাধারণ লোকদের বেলায় এই মর্যাদার বিষয়টি প্রযোজ্য হয় না। উপরের আয়াতে যে সকল গুণ-সম্পন্ন মানুষের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে তাদের বেলায় এই মর্যাদা যথাযথভাবে প্রযোজ্য।

উপরে বর্ণিত আয়াতসমূহের আলোকে আজকের খুতবা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই একই বিষয়ের উপর আরো কয়েকটি আয়াত সূরা মু'মিনূনেও (আয়াত-৯-১২) রয়েছে। সেখানেও এই একই বিষয়ে সামান্য পার্থক্য সহকারে বর্ণিত হয়েছে।

"এবং যারা নিজেদের আমানতসমূহের এবং অঙ্গীকারসমূহের প্রতি সর্বদা যত্নবান। এবং যারা সততার সাথে নিজেদের নামাযের হেফাযত করে (২৩ঃ১০)"। তারা এমনভাবে নামাযের হেফাযত করে যে, নামাযও তাদের হেফাযত করে।

এর পরের আয়াতটি পূর্বে বর্ণিত বিষয়-বস্তুর মধ্যে আর একটি অতিরিক্ত অর্থ সংযোজন করছে-"তারাই উত্তরাধিকারী"। "তারা উত্তরাধিকারী হইবে ফেরদৌসের" (২৩ঃ১২) যেখানে তারা চিরকাল বাস করবে। এখানে 'মুকরামূন' – (সম্মানিত) না বলে 'ফেরদৌস,- বলা হয়েছে। এই কারণে সাধারণ পাঠক উভয় শব্দের অর্থ একই ধরে নেয় অথচ এর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে।

'ফেরদৌস'ও একটি উচ্চ মকামের জান্নাতের নাম। কিন্তু 'ওয়ারেসুন' বলে এখানে অতিরিক্ত অর্থ সংযুক্ত হয়েছে যে, এরা ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী হবেন। যেমন, ওয়ারিস হওয়া অর্থ ওয়ারিসের অধিকারী (পাওনাদার) হওয়া। যে-সম্পদ কেউ রেখে গেছেন ওয়ারিসগণ তা পাওয়ার সবচেয়ে বেশী অধিকারী। এখানে বলা হয়েছে "এরা জান্নাত ওয়ারিস সূত্রে পাবেন।" যারা 'ফেরদৌস' নামক জান্নাত লাভ করবেন। 'ফেরদৌস' বড় উচ্চ মকামের জান্নাত। 'মুকরামূন' এর অর্থ ভিন্ন। 'মুকরামূন' জান্নাতটি ফেরদৌসের চেয়েও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। জান্নাতিরা সেখানে চিরকাল বাস করবেন।

এবার আঁ হযরত (সঃ)-এর কয়েকটি হাদীসঃ প্রথম হাদীস (মুসলিম-কিতাবুয্ যাকাত) হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমান এবং মুসলমানদের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছে যদি সে ন্যায়পরায়ণ হয় তবে তাকে যা আদেশ দেয়া হয় সে তা যথাযথভাবে পালন করে এবং যখন কোন ব্যক্তিকে কিছু মাল দিতে বলা হয় সে খুশী মনে ঐ পরিমাণ মাল তার প্রাপ্য মনে করে তাকে দিয়ে দেয়। এমন ব্যক্তিও বাস্তবে সদকা-দাতা বলে গণ্য হবে"।

এটি একটি বড় সূক্ষ্ম নসীহত, অনেকে খেয়াল রাখে না। আমার অভিজ্ঞতা আছে যে, এমন লোক যারা বিষয়টি বুঝে নি এবং পরে তার নিজ নফসের দৈন্যতা তার নিজের বিরুদ্ধে সফল হয়েছে যার ফলে সে অনেক পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। অতএব, আঁ হযরত (সঃ) এ সমস্ত বিষয়কে যে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করেছেন এবং আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন আমাদের বিবেচনা করে দেখা উচিত যে, হুযূর (সঃ) কী বলতে চেয়েছেন। এখানে দেখুন যা বলা হয়েছে, 'দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি তো কেবল দায়িত্ব পালন করেছে' এটা তার পক্ষে থেকে সদকা কি করে হয় গেল ? একজনকে যা বলা হয়েছে সে তো তা করবেই। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সে সানন্দে প্রশস্ত হৃদয় নিয়ে তা করেছে। অনেকে এমন আছে যে, সে যখন শুনে যে, 'অমুককে কিছু টাকা দিয়ে দাও, তখন তার দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তি ঐ টাকাটা পাওয়ার যথাযোগ্য মনে হয় না। অথচ আমার দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তি পাওয়ার যোগ্য হয়। আমার দৃষ্টিতে পাওনাদার হওয়ার মাপকাঠি ভিন্ন। কোন সময় কোন ব্যক্তি কেবল 'সান্ত্বনা-পুরস্কার'-হিসাবে কিছু পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি এমন হয় যে, ঐ টাকা পেয়ে ধর্মের বেশী নিকেট এসে যায়। 'মুয়াল্লেফাতেল কুলুব' – বলেও তো একটা বিষয় রয়েছে। কিন্তু যারা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এসব বিষয় দেখে না তারা মনে করে যে, এসব ভুল হচ্ছে। অমুক ব্যক্তি কীভাবে জামাতী সাহায্য পাওয়ার যোগ্য হয়ে গেল ? তারা এটাও তো জানে না যে, ঐ সাহায্যটা আমার ব্যক্তিগত হিসাব থেকে দেয়া হয়েছে, অথবা জামাতের ফান্ড থেকে দেয়া হয়েছে, অথবা এমন ফান্ড থেকে দেয়া হয়েছে, জামাতের হিসাব বই-এ যার উল্লেখ নেই। এ সমস্ত বিষয়ে অবগতি ছাড়াই তারা নিজেরা মনে মনে একটা ফয়সালা করে নেয়। এমনই এক ব্যক্তিকে একবার বলা হয়েছিল যে, অমুককে এত টাকা দিয়ে দাও। আমি দুঃখিত যে, এই ব্যক্তি সে টাকা ঐ ব্যক্তিকে দেয়নি। অবশেষে যখন কমিশন বসানো হলো বিষয়টি তদন্তের জন্য তখন সে বলল যে, এ ব্যক্তি তো এই টাকা পাওয়ার যোগ্যতাই রাখে না। তুমি বেশী জান না, যুগ-খলীফা বেশী জানেন, যিনি ঐ টাকা সরবরাহ করেছিলেন ? যদি তিনি ভুল করেই থাকেন তবে তিনি আল্লাহ্‌র সামনে জবাবদিহি করবেন। তোমার উচিত ছিল আদেশ পালন করা। আঁ হযরত (সঃ) তো শর্ত রেখেছেন যে, প্রশস্ত মন নিয়ে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে সানন্দে তুমি তার প্রাপ্য মনে করে তাকে দিয়ে দিতে। যার পাবার অধিকার আঁ-হযরত (সঃ) কায়েম করে দিয়েছেন। অথবা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যদি প্রাপ্য বলে (বিবেচনা করে) দিয়ে দেয় তবে সেখানে অন্য কারো কিছু করার থাকে না, আর না ঐ সাহায্যকে বন্ধ করে দেয়ার যোগ্যতা থাকে। তার নিজের হীনমন্যতার কারণে নিজেকে ঐ সদকার প্রতিবন্ধক বানানো উচিত ছিল না। যদি সে এমন করে তবে পথভ্রান্ত হতে হতে বহু দূরে গিয়ে পড়বে।

হযূর (সঃ) বলেছেন, ঐ ব্যক্তি (দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি) যদি আন্তরিকতার সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে ঐ সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ঐ সাহায্য পৌঁছে দেয় তবে সে-ও সদকা দাতা বলে গণ্য হবে। এর চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় কথা আর কী হতে পারে। নিজ পকেট থেকে কিছু দিতে হল না তবুও সদকা দানের পুণ্যের অংশ পেয়ে গেল।

এখানে 'সানন্দে' বা স্বাচ্ছন্দ্যে ঐ টাকা দিয়ে দেওয়ার মধ্যে 'স্বাচ্ছন্দ্যে' বিষয়টি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। যদি কাউকে কিছু দেয়া হয় কিন্তু মুখ ভারী করা হয় বা তার কপাল কুঞ্চিত হয়, তবে, এক্ষেত্রে যে নিতে বাধ্য হচ্ছে সে মনঃকষ্টের সাথে তা গ্রহণ করবে। যেহেতু সে অবস্থার চাপে পড়ে বাধ্য হবে নেওয়ার জন্য, সে নিবে ঠিকই কিন্তু তার মনে বড় কষ্ট হবে। সে (মনে মনে বলবে) নিচ্ছি বাধ্য হয়ে নতুবা নিতে ইচ্ছা করছে না।

এমনও ঘটনা আমার জানা আছে যে, যাকে দেওয়া হয়েছিল সে ফেরত দিয়েছে, সে চিন্তা করে নি যে, ঐ টাকা যার হাত দিয়ে পাচ্ছে সেই টাকা তার পক্ষ থেকে নয় বরং আমার পক্ষ থেকে ছিল। কিন্তু আসলে এটা তার মানসিক দুর্বলতা ছিল। যেহেতু তাকে যে হাত থেকে নিতে হচ্ছিল তার চেহারা চোখে পড়ছিল। যে হাত থেকে নিতে হয় সেই চেহারার মধ্যে যদি বক্রতা চোখে পড়ে তবে এতে অবশ্যই কষ্ট হয়। এই কারণেই আঁ হযরত (সঃ) শর্ত লাগিয়েছেন যে, প্রফুল্ল চিত্তে যেন দেওয়া হয়। যে গ্রহণ করবে সে যেন আনন্দিত হয় যে, আমাকে যে দিচ্ছে সে আনন্দের সাথে দিচ্ছে।

অতএব এই হচ্ছে তাকওয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রাস্তা যা আঁ হযরত (সঃ) আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন আর তিনি (সঃ) ছাড়া অন্য কেউ এমন শিক্ষা দিতে পারেন না।

আরও একটি হাদীস হযরত ওবায়দা বিন সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে (মসনদ আহমদ)। হযরত ওবায়দা বিন সামেত (রাঃ) বলেছেন যে, হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, (নিজ নফ্সের) নিজের পক্ষ থেকে আমাকে ছয়টি বিষয়ে নিশ্চয়তা দাও, আমি তোমাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। অতি চমৎকার ব্যবসা (লেনদেন), বড় গৌরবময় ব্যবসা ! আঁ হযরত (সঃ) যদি জান্নাতের নিশ্চয়তা দেন তবে তার জন্য জান্নাত অবশ্যম্ভাবী। হুযূর (সঃ) আল্লাহ্‌র মর্জি ব্যতীত এমন কথা বলতেই পারেন না। তিনি তো জান্নাত বিতরণকারী ছিলেন না। আল্লাহ্ তাঁকে যতটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি আমানতের যথাযোগ্য ব্যবহার করেছেন। আমানতের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, অথচ যে জান্নাতের খবর দেয়া তাঁর (সঃ) ক্ষমতার বাইরে তিনি সেই জান্নাতের খবর দিচ্ছেন, এটা হতেই পারে না। অতএব, অবশ্যই এই হাদীস – হাদীস কুদসীর মধ্যে শামিল ধরতে হবে এই মর্মে যে, তিনি (সঃ) অবশ্যই আল্লাহ্‌র অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েই এমন বলেছেন। অতএব, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিশ্চয়তা পাবার পরে এখন শুনুন ঐ ছয়টি কথা কী কী ? **"যখন কথা বলবে, সত্য কথা বলবে"**। একথা কত সহজ আবার কত কঠিন। 'যখনই কথা বল সত্য বল'। অর্থাৎ সর্বদা আমাদের কথা বলার পূর্বে চিন্তা করে দেখা উচিত। কারণ মানুষের মন প্রায়ই অনেকটা মিথ্যা জড়িয়ে দেয় কথার মধ্যে। মিশ্রণ হতে থাকে তখন কথা আর সত্য থাকে না। ঐ ছয়টির প্রথম কথাটিই কত সহজ আবার কত কঠিন । হুযূর (সঃ) বলেছেন, এমনই কর তবে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। কিন্তু আরও পাঁচটি কথাও রয়েছে। হযরত রসূল করীম (স:) একদা এক ব্যক্তিকে কেবলমাত্র সত্য কথা বলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে বলেছেন। ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, ঐ ব্যক্তি এক এক করে সমস্ত পাপ থেকে উদ্ধার পেয়ে গিয়েছিলেন এবং সমস্ত পুণ্যকর্ম করার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছিলেন। অতএব, হুযূর (সঃ)-এর এক একটি বাক্য খুব ভালভাবে বুঝে নেওয়ার দরকার এবং ওজন করে দেখার মতো। ওজন করে দেখুন এক একটা কথা কত মূল্যবান!

(দ্বিতীয় কথা) "যদি তুমি কোন অঙ্গীকার কর, তবে তা অবশ্যই পূর্ণ কর।" মূলতঃ এটি সত্য বলারই একটি দিক মাত্র। মৌলিক সত্য বিষয় এই যে, যদি এক ব্যক্তি সত্যবাদী হয় এবং কারো সাথে কোন অঙ্গীকার করে তবে তা অবশ্যই সে পূর্ণ করবে।

(তৃতীয় কথা) "যদি তোমার কাছে কোন আমানত গচ্ছিত রাখা হয় তবে তুমি তা যথা সময়ে তা মালিককে ফেরত দিবে। এ সমস্ত কথাই মূলতঃ সত্য বা সত্যবাদিতার বিভিন্ন দিক। মৌলিক বিষয় সত্য বা সত্যবাদিতা। প্রকৃত 'সত্যবাদিতা' সাজারায়ে ত্বাইয়্যেবাহ–পবিত্র বৃক্ষ, বাকী সব ঐ বৃক্ষের ফলস্বরূপ। আঁ হযরত (সঃ) এই পবিত্র বৃক্ষের বিভিন্ন ফলের কথা বলেছেন।

(চতুর্থ) "নিজ লজ্জাস্থানগুলোকে রক্ষা কর। এগুলো আমানতস্বরূপ। আল্লাহ্‌তাআলা এগুলো কোন্ উদ্দেশ্যে দান করেছেন। অতএব, আমানত রক্ষার বিষয়টি এখানেও বিদ্যমান।

(পঞ্চম) 'দৃষ্টি সংযত রাখ', গায্‌যে বসর এর অর্থ করা হয় দৃষ্টি নিম্নে রাখ। অথচ এটি সঠিক অর্থ নয়। **গায্‌যে বসর এর ঠিক অর্থ এই যে, দৃষ্টি হঠাৎ যদি এমন কিছুর উপর পড়ে যার ফলে মনের মধ্যে অন্যায় অনুভূতি বা আবেগ সৃষ্টি করে সেখান থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে নিবে। কোন চেহারার উপর এভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করা যেখানে তুমি তার রূপ সৌন্দর্য খুঁজে পেতে চাচ্ছ। তার শরীরকে এভাবে না দেখ যে, সেখান থেকে তুমি তোমার যৌন পিপাসা মেটাতে চাচ্ছ। এর নাম গায্‌যে বসর। লজ্জাস্থানসমূহকে রক্ষার সাথে এর বড় গভীর সম্পর্ক।**

(ষষ্ঠ) "নিজ হস্তদ্বয়কে সংযত রাখ।" হাতকে সংযত রাখার অর্থ এই যে, যারা বদ-মেজাযী, কথাকে বিচার-বিবেচনা করে না হঠাৎ করে রেগে যায়। বুঝে না যে, কোথায় কখন তার হাত তোলার অধিকার আছে। হঠাৎ করে যাদের হাত উঠে যায় নিজের অজান্তে বার বার খুতবায় নসীহত শোনার পরও যাদের বদ-অভ্যাস দূর হয় না। কোন কোন মায়েরও এমন বদ-অভ্যাস থাকে। ভুল করতেই ঠাস করে থাপ্পর মেরে দেয়। তাদের মনেই থাকে না যে, এখন মোলাকাতে বসে আছেন [হুযূর (আইঃ)-এর সাক্ষাৎকালীন সময়ে]। এখানে কী ধরনের মন্দ প্রভাব পড়েছে। এটা তো রীতিমত 'বে-আদবী'। মুলাকাত চলাকালীন সন্তানদের সাথে এমন অসৎ ব্যবহার করছে। তাদের মাথায় যে কথা থাকে তখন তা এই যে, হুযূর (আইঃ)-এর সামনে শিশু সন্তান এমন করছে – এতো হুযূর (আইঃ)-এর মনে মন্দ প্রভাব পড়বে অথচ, এটাও এক ধরনের লোক দেখানো আচরণ। এমন ব্যক্তিকে আমি যখন গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করি তখন আমি বুঝতে পারি যে, এরা নিজেদের গৃহে বাচ্চাদের একেবারে ছুটি দিয়ে বসে থাকে। নতুবা তারা বাইরে এরূপ আচরণ করত না। নিজের বাড়ীতে তাদের যা খুশী করে বেড়ানোর সুযোগ দিয়ে রেখেছে। যখন তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে তখন মুলাকাতের সময় নিজেদের গাফিলতির উপর পর্দা দেয়ার চেষ্টা করে এরূপ কঠিন আচরণ করে বাচ্চাদের উপর।

কোন সময় তো ঐ শিশু সন্তান (থাপ্পর খেয়ে) এমনভাবে মায়ের দিকে চেয়ে দেখে যে, স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সে মনে মনে (যেন) বলছে, "তুমি এমন ! বাড়ীতে তো কখনও নিষেধ করনি, এখানে হুযূরের সামনে আমার সাথে এ দুর্ব্যবহার করছ" ? তাদের চোখে এত ক্রুদ্ধ দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয় যে, বুঝা যায় যে, কি হয়েছে। তাদের চেহারা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়। এসব ছোট ছোট বিষয় থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পবিত্র বাণীর মাধ্যমে হুযূর (সঃ) বলেছেন, 'হাতকে নিয়ন্ত্রণে রাখ।' যখনই হাত উঠতে চায় তখন ধরে রাখ' চিন্তা কর যে, হাত উঠানো কি এখানে উচিত হবে ? বিষয়টি কি আসলে ততটা ঠিক ?

উপরে উল্লেখিত ছয়টি কথা হুযূর (সঃ) বলেছেন যে, এসব বিষয়ে তোমরা নিশ্চয়তা দাও যে, তোমরা পালন করবে। আমি তোমাদিগকে

জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। দেখুন, এমন ব্যক্তির তো জান্নাতের নিশ্চয়তা পাওয়া উচিত নতুবা জান্নাত আর কার জন্য হতে পারে ?
কিন্তু মৌলিক বা কেন্দ্রীয় কথা হল, 'সত্য' বা সত্যবাদিতা। কোন কোন হাদীসে সে কথাও উল্লেখ আছে।
আর একটি হাদীস হযরত আব্দুর রহমান বিন্ সাআদ থেকে বর্ণিত (সুনানে আবূ দাউদ) আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "রোজ কেয়ামতে সবচেয়ে বড় 'আমানত' বলে গণ্য হবে। দেখুন এখানে হুযূর (সঃ) কী বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বড় আমানত বলে গণ্য হবে যে বিষয়টি তা হচ্ছে এই যে, এক দম্পতি একে অপরের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করেছে। তারপর স্বামী তার স্ত্রীর গোপন বিষয় অন্যদের মধ্যে বর্ণনা করে বেড়ায়।" দেখুন ! বড় আমানত কোন্‌টি ? কারণ হলো এই যে, আল্লাহ্‌র আদেশে তাকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল যে, একজন স্ত্রীলোকের সাথে এভাবে মিলিত হতে পারে। "এখানে বিষয়টি বুঝতে হলে নিজ লজ্জাস্থানসমূহ রক্ষা কর"– আদেশটি স্মরণে রেখে বুঝতে চেষ্টা করুন। এক মহিলা (স্ত্রী) নিজ শরীরের বস্ত্র একজনের (স্বামীর) সামনে এই জন্য খুলেছিল যে, আল্লাহ্ পাক আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ্‌র দেওয়া আমানত নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়েছিল। অন্য কোন পুরুষের সেখানে প্রবেশের কোন অধিকার ছিল না। এই অর্থে এটি অনেক বড় আমানত হয়ে যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি কোন স্বামী নিজ স্ত্রীর গোপন বিষয় অন্য পুরুষের সামনে বর্ণনা করে আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতে দিন এই পুরুষ আমানতের বড় খেয়ানতকারী বলে গণ্য হবে। এর পরিণাম হবে জাহান্নাম। এই বিষয়টি এমন, যা সমাজে পরিলক্ষিত হয়। অনেকে একে অতি সাধারণ বিষয় বলে মনে করে।
দুই প্রকারের বিষয় সমাজে বিষ-ক্রিয়া সৃষ্টি করে যাচ্ছে। প্রথমতঃ অনেকে কেবলমাত্র বন্ধুদের সামনে নিজ স্ত্রীর রূপ বা সৌন্দর্যের কথা বলে আনন্দ বা উপভোগ করতে চায়। অথবা স্ত্রীর দুর্বলতা প্রকাশ করে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করতে চায় যে, আমি তো এমন স্ত্রী পেয়েছি। উভয় ক্ষেত্রেই বিষয়টি অত্যন্ত ঘৃণিত বা জঘন্য এবং সমাজকে কলুষিত করে।
তবে হ্যাঁ, আর একটি দিকও আছে। স্বামী-স্ত্রী যতদিন একত্রে বসবাস করেছে ততদিন সব ঠিকঠাক, কোন কথা নেই। কিন্তু যখন ত্বলাক বা খোলা হয় বা কোন কারণে পৃথক হয়ে যায়, তখন তাদের মন পড়ে। তখন বলতে আরম্ভ করে যে, ওর মধ্যে তো এই দোষও ছিল। আমি ঐ কথাগুলো এখন বলছি না এক অপরের অসৎ ব্যবহার সম্পর্কে তারা একে অপরের সাথে ভাল ব্যবহার করত না একথা এখানে বলছি না। এখানে এখন বলছি। গোপনীয়তা প্রকাশ করার কথা। যখনই এসব কথা আমার সামনে আসে তখন আমি তাদের বলেছি যে, এ ধরনের কথা বাইরে বলা কোন মতেই জায়েয নয়। আমাকেও জানানো উচিত ছিল না। এসব কথা গোপন রাখা, আল্লাহ্‌র আমানত। তোমরা খেয়ানত-কর্মের মধ্যে আমাকেও শামিল করেছ। আমি যদি তোমাদের প্রত্যাখ্যান না করি তবে আমিও 'খায়েন'(আমানত খর্বকারী) বলে গণ্য হব। অতএব দাম্পত্যের বন্ধন কায়েম আছে বা ভেঙ্গে গেছে, এসব আমানত এমন, যা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। কোন স্বামী তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ভঙ্গ করবে না। কেননা, এগুলো আল্লাহ্‌র আমানত। এবং তাদের উভয়কেই এই আমানত রক্ষা করার জন্য দায়ী করা হয়েছে। এবং জবাবদিহী করতে হবে। এ কথাগুলোকে খারাপ কথা মনে করবে না, এগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথা, এগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে।
আঁ হযরত (সঃ) যেমন বলেছেন, "স্ত্রীর গোপন বিষয় বাইরের পুরুষদের মধ্যে বলে বেড়াবে না। এটা কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বড় আমানতের খেয়ানত বলে গণ্য হবে।
এখানে মহিলাদের কথা (হাদীসে) উল্লেখ নেই। কিন্তু কুরআন শরীফের কোন কোন আয়াত থেকে এ কথার প্রমাণ আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা যেহেতু একে অপরের সাথে একই ঘরে বসবাস করছ, এখন তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত, বাইরে এসব কথা বলে বেড়ানো উচিত নয়। আলোচ্য হাদীসে স্ত্রীরা যেন পুরুষদের গোপনীয়তার কথা বাইরে প্রকাশ না করে। একথা না থাকার কারণ এ-ও হতে পারে যে, স্ত্রীদের তুলনায় এই দুর্বলতা পুরষদের মধ্যে বেশী। এ ধরনের লজ্জাজনক কথা প্রচার করা স্ত্রীলোকদের প্রকৃতিগত বা সহজাত লজ্জার বিপরীত। সুতরাং এটা মহিলাদের জন্য প্রশংসনীয় কথা বটে। এখানে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে যে, এই রোগটা পুরুষদের মধ্যে বেশী।
কোন কোন সময় মহিলারা আমাকে বলে যে, আপনি শুধু আমাদের দুর্বলতার কথাই বলেন পুরুষদের দুর্বলতার কথা বলেন না। কিন্তু তারা যদি মনোযোগ দিয়ে আমার খুতবা শুনে তবে বুঝবে যে, পুরুষদের (দোষের) কথাও বলি। তবে মনে রাখতে হবে যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর ন্যায়-বিচার খুবই উচ্চ মার্গে অবস্থান করছে। তাঁর (সঃ) উপর কারো কোন স্থান সম্ভব নয়। তিনি (সঃ) উভয়ের কথাই বলেছেন। হুযূর (সঃ) যা বলে গেছেন, আমি তো তা-ই আপনাদিগকে বলি।
এবার বুখারী শরীফ থেকে একটি হাদীস। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন যে, "যখন আমানত নষ্ট হতে থাকবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। প্রশ্নকারী প্রশ্ন করছিলেন যে, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমানত নষ্ট হওয়ার অর্থ কী ? হুযূর (সঃ) বলেছেনঃ
"যখন অযোগ্য লোকদেরকে দেশের সরকার প্রধান বানানো হবে, তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করবে"। এর একটা দিক জার্মানীতে বলেছি যে, **জামাতের কর্মকর্তাদের জন্য আমারও এই একই নির্দেশ, জামাতের কাজের জন্যেও আপনারা যোগ্য লোকদেরকে নির্বাচন করবেন। যদি নির্বাচিত ব্যক্তিগণ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা পরিত্যাগ করে তবে জামাতী নেযাম সম্পূর্ণরূপে উল্টে যাবে, এই অর্থে কেয়ামত হবে। যেমন ধরুন কেয়ামত এসেই গেছে।**
অপর একটি দিক "ইয়া ওচ্ছেদাল আমরো ইলা গয়রি আহ্‌লিহী ফান তাযিরুস্ সাআতা" – অর্থ ঃ যখন কোন ব্যক্তিকে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় জনসাধারণের পরামর্শ এবং তাদের ভোটের মাধ্যমে, কিন্তু তারা যদি যোগ্য না হয় তবে, কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। এর অর্থ এই নয় যে, তখনই কেয়ামত আসবে। কেয়ামতের অনেকগুলো অর্থ অভিধানে উল্লেখ রয়েছে। এক অর্থ এই যে, সমাজের উপর যেমন কেয়ামত ভেঙ্গে পড়বে (দুর্যোগ দুর্ভোগ নেমে আসবে)। যদি তোমরা ভুল কর্মকর্তা নির্বাচন কর, তবে সর্বদা (নেযাম) ব্যবস্থাপনা বিকৃত হতে থাকবে। এখানে 'সাআত' অর্থ এই যে, যেহেতু 'সাআত' অবশ্যই দুষ্ট মানুষের উপর আপতিত হবে। সুতরাং সমাজ ব্যবস্থা অধঃপতিতই থাকবে, মন্দ থেকে মন্দ হতে থাকবে। আঁ হযরত (সঃ) খবর দিয়ে রেখেছেন যে, সাআত দুষ্ট লোকদের উপর আসবে এর অর্থও হুবহু সঠিক।
"সমাজ ব্যবস্থা নষ্ট হতে থাকবে, মানুষ খারাপ হতে থাকবে। এমন কি তাদের আযাবের সময় এসে যাবে। এই বিষয়টাকে বিবেচনা করে দেখতে পারেন। এমন সমাজের চিত্র আপনাদের মানস-পটে ভেসে উঠবে সেখানে কিয়ামত ভেঙ্গে পড়েছে। দিন দিন অবস্থা আরো শোচনীয় হয়েই চলেছে। (কেয়ামত ভেঙ্গে পড়া অর্থ অভাবনীয় দুর্যোগ ও দুর্ভোগ নেমে আসা) জনগণ নির্বাচনের সময় দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেনি। যেহেতু তারা আমানত আদায় করেনি। অতএব, আল্লাহ্ তাদের সাথে 'খায়েন' (আমানত খর্বকারী) হিসাবেই আচরণ করছেন।

এবার আব্দুল্লাহ্ বিন্ আমর (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস যেখানে আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, হযরত হাসান থেকে বর্ণিত। এখানে হযরত হাসান-এর সাথে কেন (রাঃ) লেখা হয়নি, ভুল নাকি ? এখানে অন্য কোন হাসান ?

হযরত হাসান আব্দুল্লাহ্ বিন আমর থেকে বর্ণনা করেছেন ; সম্ভবতঃ রেয্ওয়ানুল্লাহে আলায়হিম হওয়া উচিত ছিল। ভুলে বাদ পড়ে গেছে।

"আঁ হযরত (সঃ) আমাকে বলেছেন, যখন তুমি নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে হবে তখন তোমার কী অবস্থা হবে ?" আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! তা কীভাবে হবে যে, আমি নিম্ন শ্রেণীর লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব" ?

এখানে আর একটি খবর ছিল যেদিকে সাধারণদের দৃষ্টি যায় না। হুযূর (সঃ) যার সাথে কথা বলেছিলেন তার দীর্ঘ জীবনের সুসংবাদ ছিল আর একই সাথে এই দুঃসংবাদ যে, দীর্ঘজীবন হওয়ার ফলে তিনি ভাল লোকের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এমন এক যুগে প্রবেশ করবেন যেখানে তাকে মন্দ লোকদের সাথে বসবাস করতে হবে। দীর্ঘজীবী হওয়ার ফলেই এমন হওয়া সম্ভব ছিল। এবং ঠিক একই সাথে আঁ হযরত (সঃ)-এর সত্যতা এবং সঠিক সংবাদদাতা হওয়ারও প্রমাণ রয়েছে এখানে।

প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (সঃ) বলেন, 'যখন মানুষ অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, আমানত রক্ষা করবে না'। তারপর হুযূর (সঃ) দুই হাতের আঙ্গুলসমূহ একে অপরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে বললেন; সমাজের মানুষ এমন হয়ে যাবে (অর্থাৎ চিরুনীর দাঁতের মত পাশাপাশি সারিবদ্ধ না হয়ে একটার মধ্যে অপরটির প্রতিবন্ধক হয়ে – অনুবাদক) মানুষের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যাবে, প্রতি বন্ধকতা হয়ে যাবে এবং ঐক্য সৃষ্টি করার সকল চেষ্টা করলেও তা আর সম্ভব হবে না। এমন মানুষ যখন পরস্পরবিরোধী সৃষ্টি হয়ে যায় তখন ঐক্যের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

দেখুন, কি চমৎকার উদাহরণ দিয়ে এমন মন্দ জাতীয় অবস্থার কথা ব্যক্ত করেছেন, যাদের আমানত নষ্ট হয়েছে, যাদের অঙ্গীকার পূরণ করা হয় না, তাদের অন্তরে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবেই। কোন মতেই তাদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। তাদের মধ্যে এমন ভেদাভেদ সৃষ্টি হয় যে, তারা বড় বড় দাবী করবে মৌখিক। বড় বড় দল বাঁধবে যে, জাতির ঐক্য পুনরায় সৃষ্টির জন্য চেষ্টা কর। কোন কোন সময় শরীয়তকেও ব্যবহার করবে যার ফলে ঐক্য সৃষ্টি না হয়ে জাতি আরো বেশী দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়বে।

এই হচ্ছে ঘটনা। আঁ হযরত (সঃ)-এর সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু পূর্ণ হয়েছে। শতকরা একশ' ভাগ পূর্ণ হয়েছে, সত্য হয়েছে। বর্ণনাকারী সাহাবী (প্রশ্নকারী) জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! ঐ সময় আমার কী করণীয় হবে ? তিনি বললেন, আমার অবস্থান ঐ সকল নিচু প্রকৃতির লোকদের মধ্যে হবে। পুরো সমাজ যদি ঐ রকম হয়ে যায়, তবে এমন সময় আমার কী করণীয় হবে ? আঁ হযরত (সঃ) বললেন, "আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং যে বিষয়ে তুমি খুব ভাল করে বুঝবে যে, এটা তোমার করা উচিত, তুমি তা-ই করবে। আর যে বিষয়কে তুমি সঠিক বলে জানবে না, তা করবে না।" এমন সমাজে ভুল খবরও প্রচার হয়ে থাকে। অধিকাংশ সময় ভুল খবরের ফলে সমাজ আরো বিভ্রান্ত ও বিনষ্ট হতে থাকে। হুযূর (সঃ) কত চমৎকার নসীহত করলেন যে, অনেক কথা শুনবে। কত প্রকারের কথা বলা হবে। যে কথা সম্পর্কে সঠিক তথ্য বা জ্ঞান লাভ হবে কেবলমাত্র সেই কথাকেই গ্রহণ করবে। বাকী সকল কথা পরিত্যাগ করবে। আর তোমার বিশেষ সম্পর্ক যাদের সাথে তাদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবে।" এখানে দেখুন, আজকের অবস্থায় যদি আহমদী আহমদীদের সাথে বিশেষ ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে না থাকে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় না করে তবে কি দাঁড়াবে ? অতএব কোন অবস্থাতেই সম্পর্ক যেন ছিন্ন না হয়। আহমদীদের তরবীয়তের এর চেয়ে বেশী আর কোন নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব নয়। তারা (আহমদীরা) যদি পরস্পরের সাথে সুদৃঢ়-বন্ধন না রাখে তবে তারাও বাকীদের মতো হয়ে যাবে, তাদের অংশ হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে সরতে সরতে তাদের (গয়ের আহমদীদের) মধ্যে মিশে যাবে। আমি আমার সফরকালে বারবার দেখেছি যে, আল্লাহ্র ফযলে ঐ সব পরিবার রক্ষা পেয়েছে যারা নিজেদের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সর্বদা আহমদীদের প্রয়োজন বোধ করেছে। অনেকে নিজের ভাল উচ্চ পদের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে অন্য শহরে এজন্যে স্থানান্তরিত হয়ে যান যেন আহমদীদের নিকটে বসবাস করতে পারেন। অনেকে আমাকে লেখেন যে, এভাবে স্থানান্তরিত হওয়াতে আমাদের আর্থিক ক্ষতি হলেও আমরা তার ভ্রূক্ষেপ করি না। কারণ, যেখানে ছিলাম সেখানে আমরা একা ছিলাম। ছেলেমেয়েরা ঘরে আবদ্ধ থাকত। আমরা সন্তানদের তরবীয়তের দিকে খেয়াল রেখে পার্থিব বা জাগতিক সুবিধাকে ঘৃণাভরে ত্যাগ করে স্থান পরিবর্তন করেছি। যেন তারা আহমদী সমাজে মেলামেশার সুযোগ লাভ করতে পারে। এখানে এটাই নসীহত যে, সমাজে যখন ভাল মানুষ বা আপন জনের বড় অভাব হবে তখন চেষ্টা করে নিজেদের লোকদের সাথে একত্রিত হয়ে বসবাস করবে। পরস্পর একে অপরের নিকটে থাকবে একে অপরের সহায়তা করবে। পরস্পরকে মন্দ প্রভাব থেকে রক্ষা করবে। এবং আপামর জনসাধারণের সঙ্গ ত্যাগ করবে। তাদের থেকে দূরে সরে থাকবে। নিজেদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা, আবার অন্যদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখা একই সময়ে সম্ভব হতে পারে না। যখন তোমরা পুণ্যবান লোকদের সমাজে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করবে, তখন অন্যদের সাথে বাহ্যতঃ সামাজিক সম্পর্কই থাকতে পারে কিন্তু আন্তরিক হৃদ্যতা সৃষ্টি হতে পারে না। তাদের সাথে হৃদয়ের ভালবাসার সম্পর্ক হতে পারে না, অসম্ভব। তাদের থেকে দূরে থাকবে। দূরের অর্থ এই নয় যে, সমাজে বাস করবে না। কারো কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ হবে না। বরং অন্তর বা হৃদয়কে দূরে রাখবে।

আরও একটি হাদীস বর্ণনা করছি। হযরত হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আঁ হযরত (সঃ) আমাদের সামনে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন"।

হাদীসের বিষয়-বস্তু বুঝতে সহজ করার জন্য তিন অংশে বিভক্ত করেছি। প্রথম অংশে আঁ হযরত (সঃ)-এর একটি হাদীস। দ্বিতীয় অংশে আর একটি হাদীস আর তৃতীয় অংশে রেওয়ায়াত বর্ণণাকারী হযরত হোযায়ফা (রাঃ)-এর মন্তব্য। (কিতাবে বর্ণিত হাদীস হিসাবে একটি হাদীস) সাহাবী (রাঃ)-এর যে মন্তব্য সেটি মূলতঃ হাদীস নয় বরং 'আসর' বলা হয়।

হযরত হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, "আঁ হযরত (সঃ) আমাদের সামনে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছিলেন; যার মধ্যে একটি তো আমি দেখেছি আর অপরটির অপেক্ষায় আছি। হুযূর (সঃ) বলেছেন, 'আমানত মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত রয়েছে' এর অর্থ কী ? অর্থ এই যে, আমানত মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত বা স্বভাবজাতভাবে সংস্থাপিত আছে। যার শিকড় মানুষের হৃদয়ে প্রোথিত আছে। যদি

আমানত মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টিই না করা হতো তবে বাইরের উপমা বা উদাহরণ দিয়ে মানুষকে বুঝানো সম্ভব হত না। সুতরাং প্রকৃতিপ্রদত্ত আমানতও একটি আমানত।

দ্বিতীয় আমানতঃ কুরআন শরীফ, যা আঁ হযরত (সঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছে।

তৃতীয় আমানত এই যে, আঁ হযরত (সঃ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমানত / দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে কুরআনের উপর আমল করে দেখিয়েছেন এই দু'টি বিষয় সে-ই বুঝতে পারবে যার অন্তরে প্রথম আমানতের শিকড় প্রোথিত আছে। যদি কারো অন্তরে আমানতের শিকড় প্রোথিত না হয়ে থাকে তাকে পরের আমানতের উদাহরণ দিয়ে বুঝানো যাবে না। এই ব্যাখ্যার পরে মূল হাদীস দেখুন।

হুযূর (সঃ) বলেছেন, "আমানত মানুষের হৃদয়ের গভীরে মূলের বা শিকড়ের আকারে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর সে নিজ অন্তরের আমানতকে কুরআন ও সুন্নত মোতাবেক পেয়েছে"।

অর্থাৎ সে কুরআন সুন্নতের বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেখে নিজ অন্তরের আমানতকে উপলব্ধি করেছে। নতুবা (কুরআন ও সুন্নতের সাহায্য ছাড়া) মানুষ সবাই নিজ নিজ অন্তরের গভীরে (প্রোথিত) আমানতকে উদ্ধার করতে পারত না।

যারা নিজেরা গবেষণা করে কোন কিছু উপলব্ধি করে তাদের পরস্পরের মতভেদ দেখে প্রমাণ হয় যে, মানুষ নিজে গবেষণা করে সঠিক সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না। একজন একটাকে 'সত্য' বলে বুঝেছে আর একজন অন্য একটাকে সত্য বলে বুঝেছে। **প্রকৃত সত্য এই যে, তোমরা যদি কুরআন ও সুন্নতকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি কর এবং দেখ যে, তোমার হৃদয় কুরআন ও সুন্নত মোতাবেক হয়েছে, তখন সেটা হবে প্রকৃত সত্য যেখানে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।**

আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন, "আমানতের মূল শিকড় মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত আছে। তারপর সে নিজের ভেতরের আমানতকে কুরআন ও সুন্নতের মোতাবেক পেয়েছে। তারপর হুযূর (সঃ) বলেছেন, আমানত কীভাবে উঠে যায় বা অদৃশ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রথম হাদীসে আঁ হযরত (সঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমানত'কী , কাকে বলে। তারপর দ্বিতীয় হাদীসে বলেছেন, আমানত কীভাবে উঠে যায় কীভাবে দূর হয় যায়। বলেছেন, "মানুষ যখন গাফিলতি বা অসচেতনতার মধ্যে জীবন যাপন করতে থাকে এভাবে অবশেষে তার অন্তর থেকে আমানত উঠে যায়।"

এখানে 'ঘুম' শব্দ ব্যবহার হয়েছে। অনেকে মনে করেন, মানুষ রাতে ঘুমাবে সকালে উঠে দেখবে যে, 'আমানত' তার অন্তর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে বা বেরিয়ে গেছে। এমন হয় না। এটা আল্লাহতাআলার সুন্নতের পরিপন্থী কথা। ঘুম অর্থ গাফলত বা অসচেতনতা বা অসতর্ক জীবন। মানুষ যখন দীর্ঘ দিন নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অসচেতন বা গাফেল থাকে তখন আস্তে আস্তে তার অন্তর থেকে ঐ আমানত অদৃশ্য হতে থাকে যা জন্মগতভাবে সে পেয়েছিল। অতি সামান্যই বাকী থেকে যাবে। আল্লাহ্ যা দিয়েছিলেন তা শেষ হতে হতে এক সময় প্রায় শেষ হয়ে যাবে। অতি সামান্য চিহ্ন মাত্র বাকী থেকে যাবে। তারপর সে অসচেতনতা ও গাফেলতির মধ্যে দিন কাটাবে।"

এখানে আর একটি বিষয় প্রকাশ পেয়ে গেল। যিনি প্রকৃতির বিধানকে জানেন এবং খুব বুঝেন তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এ কথা বলতে পারে না। বাহ্যতঃ এখানে বিষয়টি সমাপ্ত বলে মনে হয়। কিন্তু আঁ হযরত (সঃ) একে আরো আগে বাড়িয়েছেন বলেছেন, "যে অসচেতনতা তার মধ্যে থাকবে। অবশেষে এমন হয়ে যাবে, যেমন পায়ে ফোস্‌কা পড়ে যায়। যার মধ্যে কিছুই থাকে না। কেবল সামান্য নগণ্য পানির মত কিছু থাকে। এই রকম আমানতের কিছু অংশ তার মধ্যে থেকে যাবে।"

এখানে বলা হয়েছে যে, আমানত এমন হয়ে থেকে যাবে। এর অর্থ কী? এর অর্থ এই যে, এমন মানুষ যারা এক অসচেতনতার মধ্যে জীবন যাপন করবে। তাদের অন্তরে আমানত এমন অবস্থায় থাকবে যেমন তাদের হৃদয়ের মধ্যে ফোস্‌কা পড়ার মত হয়ে থাকবে। ঐ ফোস্‌কার মধ্যে সামান্য কিছু পানি ছাড়া কিছু থাকে না। অথচ এরা সমাজের বড় আমীন ও আমানতদার (আমানতরক্ষাকারী) সেজে বসবে। তারা নিজেদেরকে বড় আমানতদার মনে করবে। ভাববে যে, তাদের অন্তরে আমানতের বীজ আছে। অধিকাংশ মানুষ যারা অসচেতনতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায় তাদের অবস্থা এমনই হয়ে যায়। তারা মানুষকে দেখাবার জন্য অথবা নিজ স্বার্থের খাতিরে আমীন বা আমানতদার সেজে বসে। অথচ তাদের ভেতরের প্রকৃত আমানতের অবস্থা এই যে, ওটা তো একটা ফোস্‌কার মত হয়ে আছে। যার মধ্যে তরল পানি ছাড়া কিছুই নাই। মানুষ পরস্পরের সাথে লেন-দেন তো করবে। কিন্তু কেউ আমানত আদায়ই করবে না। যখন লোক দেখানো লেন-দেন করবে, কারণ এটাও তো দরকার যেন অন্যরা আশ্বস্ত হতে পারে। তাদেরকে দেখানো প্রয়োজন যে, আমরা বড় আমীন।

যখন ঐ খারাপ যুগ আসবে তখন হৃদয়ে, ঐ ফোস্‌কা থাকবে আমানত থাকবে না। ঐ ফোস্‌কা হবে দেখানোর জন্য। যেমন ফোস্‌কা ফুলে উঁচু হয়ে যায় তদ্রূপ তারা নিজেদের সম্পর্কে আমানতের স্ফীত এবং ভুয়া রূপ প্রদর্শন করবে। মানুষ একে অপরের সাথে লেন-দেন করবে। কিন্তু কেউ আমানতদার থাকবে না। সমাজ যখন বার বার ধোঁকা খেয়ে চিনে ফেলবে যে, এটা তো কেবল লোক দেখানো, ধোঁকা মাত্র। ভেতরে সব নষ্ট পানি। কেউ আমানতদার না। তখন তারা কি বলাবলি করবে ? বলাবলি করবে যে, অমুক জামাতের মধ্যে একজন 'আমীন' ব্যক্তি আছেন। খোঁজ কর এমন ব্যক্তি কে, কোথায় তিনি ?

প্রথম হাদীসে আমি যা বলেছিলাম, আমীন বা আমানতদার আহমদী জামাতের বাইরে কোথাও খুঁজে পাবে না। সুতরাং ঐ সব মানুষ যারা আমীন নয়, বিশ্বস্ত নয় কিন্তু জামাতের সুনামের কারণে মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে এমন সব ব্যক্তিদের আমি খুঁজে খুঁজে জামাত থেকে বের করছি। অনেকে মনে করছে যে, কঠোরতা প্রদর্শন করছি। আমি অবশ্যই কঠোরতা প্রদর্শন করছি না। একটি তো মাত্র জামাত যেখানে আমানতদার জামাত। এখানেও যদি 'বদ' মানুষ' লুকিয়ে থাকে তবে বাকী সাধারণ মানুষের কী হবে ? যারা 'আমীন' মনে করে জামাতের নিকট ফিরে আসে – এই বিশ্বাস নিয়ে যে 'এরা আমীন'। কিন্তু এখানে এসে পরে যদি তাদের মূলধনও নষ্ট হতে বসে তাহলে কী হবে ?

অতএব, **আহমদীয়া জামাতের এই বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করতেই হবে। যখন কোন ব্যক্তিকে ধোঁকাবাজী করতে পাওয়া যায় সাথে সাথে তাকে জামাত থেকে বের করে থাকি। এ ব্যাপারে কোন প্রকার নম্রতা দেখাই না। আপন পর কোন ভেদা-ভেদ নেই। যে কেউ হোক, আপন বা পর, এ ব্যাপারে জীবনে কখনও কারো সাথে নম্রতা দেখাই নি। ভবিষ্যতেও নম্রতা দেখাব না।** ইনশাল্লাহ্। বাকী কথা আগামীতে বলবো ইনশাল্লাহ্।

(অডিও ক্যাসেট থেকে সরাসরি শ্রুত)

অনুবাদ– মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, সদর মুরব্বী

উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ

(১৪ তম কিস্তি)

(৬) নেতৃত্ব নয় চলছে মোড়লিপনা

মানুষের সমষ্টি জীবনের যে কোন স্তরের (স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) সমস্যাদির সমাধানে ও নতুন পথের সন্ধান দিতে নেতৃত্বের স্থান যে সর্বকালীন ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা স্বীকার করতেই হবে। জনগণ নেতাদের সিদ্ধান্ত দ্বারাই শুধু নয়, তাদের ব্যক্তিত্ব, মহত্ব, হীনত্ব এবং আচার-আচরণ দ্বারাও বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণও করে থাকে। তাই নেতৃত্ব যতখানি কলুষমুক্ত, মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ, ত্যাগ-তিতিক্ষায় ভূষিত এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় থাকে ততই তা শুভ ও কল্যাণের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। এসব মানদন্ডে বিচার করলে বর্তমানে বিভিন্ন দেশ, সমাজ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরাজিত নেতৃত্ব যে ব্যাপকভাবে পচনে আক্রান্ত ও ঘূণে ধরায় জর্জরিত তা জনগণ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। তা সত্ত্বেও আমরা খুবই আশাবাদী যে, একবিংশতি শতাব্দীর মাঝেই নেতৃত্ব এবং সমাজ ব্যবস্থাপনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে। এর কারণ বলার আগে অবক্ষয়ে জরাজীর্ণ নেতৃত্বের প্রতি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি দেয়া যাক।

'চক্ষুর বদলে চক্ষু', আর 'দাঁতের বদলে দাঁত' ইহুদীদের এই শিক্ষা ও নীতি সর্বাবস্থায় সমীচীন কিনা সে তর্ক বাদ দিলেও ইহুদী রাষ্ট্রের বর্তমান হর্তাকর্তারাতো সর্বাবস্থায় ফেলিস্তিনীদের গলা কাটতেই বেশী তৎপর। তারা যেন বলতে চায় বাঁচার অধিকার শুধু তাদেরই আছে। তাদের এ নীতি যে অন্যেরাও গ্রহণ করতে পারে– এ কথা মেনে নেয়াতো বোকামীর শামেল। বাঁচার অধিকার সবারই আছে– এ নীতির মাঝে ইহুদীরাও অন্তর্ভুক্ত একথাও সবাইকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। বর্তমানে খৃষ্ট ধর্মের লোকেরা সংখ্যা ও শক্তিতে দুনিয়াতে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাদের জীবনে 'এক গালে চড় দিলে অন্য গাল পাতিয়া দাও' এ শিক্ষার ক্ষীণতম প্রতিফলনও দেখা যায় কি! বরং এর উল্টোটাই বিরাজ করছে। মারাত্মক ও সর্বনাশা মারণাস্ত্র (যেমন পারমাণবিক বোমা) আবিষ্কার ও ব্যবহার দ্বারা বিশ্বসমাজের কাছে তারা একথাই প্রমাণ করতে চায় যে, শত্রুদের যদি অস্তিত্বই বিলীন করে ফেলা যায় তাহলে গালে চড় খাওয়া ও অপর গাল পেতে দেয়ার কোন পরিবেশই বিরাজ করবে না! 'অহিংসা পরম ধর্ম' গৌতম বুদ্ধের অনুগামীদের জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নীতি হওয়া উচিত। কিন্তু তাদের অধ্যুষিত দেশগুলোতে এ 'উচিতের' তেমন কোন স্থান আছে কি? বরং ওসব দেশেতো জ্বলছে হিংসার 'অনির্বাণ' বহ্নিশিখা। মহাত্মাগান্ধী ভারতকে হিংসা-দ্বেষ মুক্ত করতে প্রাণপণই ছিলেন না, প্রাণ দিয়েছেনও। কিন্তু কৈ, ঐ দেশই তো পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হওয়ার গর্বে খুবই স্ফীত বোধ করছে। শান্তি, সততা, ঐক্য ও ধৈর্যের ধর্ম ইসলাম। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, মুসলিম জাহানে এসবের অস্তিত্ব 'অনুবীক্ষণ যন্ত্র' দ্বারাও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর! আর যতটুকু আছে কুরআনের মানদন্ডে তা খুবই নিম্নস্তরের। তা না হলে দীর্ঘকাল ধরে ইরাক ইরানে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলবে কেন? আফগানিস্তান ও আলজেরিয়ায় আত্মঘাতী রক্তক্ষয়ে মেতে উঠবে কেন? সর্বাধিক মুসলিম অধ্যুষিত দেশে দীর্ঘ ৩২ বছর শাসন চালালেন প্রেসিডেন্ট সুহার্তো। তিনিও তার পরিবার-পরিজনে চার হাজার কোটি ডলার সম্পত্তির মালিক হয় কি করে? ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-কে তো গায়ের জামা বড় কেন এই কৈফিয়তও দিতে হয়েছে। ইসলামের নামে পাকিস্তানের জন্ম। আল্লাহ্ বলেন, 'তোমরা পুণ্য অর্জনে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা কর।' (২:১৪৯)। কিন্তু পারমাণবিক বিস্ফোরণ দ্বারা পাকিস্তান কি এই নির্দেশের বিপরীত কাজ করে নি? পাকিস্তান যুক্তি দেখাতে পারে যে, প্রতিবেশীর থাবা হতে বাঁচার জন্যেই তা করেছেন। কথা হলো প্রতিবেশী যত শক্তিধর হউক না কেন, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। কথা আর না বাড়ায়ে বলা যায় সব দেশেই চলছে নীতিহীন নেতৃত্বের অবাধ বিচরণ।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও বৈষয়িকভাবে উন্নত এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী [দান নয় বরং নানা ছলাকলায় অনুন্নত দেশগুলোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া) দেশগুলোর 'শেরাদের' দু'চারটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করলে আলোচ্য বিষয় আরো স্পষ্ট হবে, আশা করা যায়। গত এক যুগের মধ্যেই জাপানের মত দেশের একাধিক প্রধানমন্ত্রীকে ঘুষের অভিযোগে পদত্যাগ করতে হয়েছে। ওয়াটারগেট কেলেংকারীতে আমেরিকার তদানীন্তন প্রেসিডেন্টকে ঐ পদ হতে সরে যেতে হয়েছে। বর্তমান (১৯৯৮) প্রেসিডেন্টের যৌন কেলেংকারীর মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে। আমরা চাই এক্ষেত্রে 'যা রটে এ কিছুটা তো বটে' এ প্রবাদ বাণী যেন প্রমাণিত না হয়। পরবর্তীতে আমাদের সদিচ্ছার শুধু অপমৃত্যুই ঘটেনি, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন যৌন কেলেংকারীতে বিশ্বকে অবাক করে দেন। ইসলামের বহুবিবাহের কথা শুনলে যাদের গাত্রদাহ হয় তারা 'হোয়াইট হাউজে' এরূপ জঘন্য কেলেংকারীকে কি 'মহৎ' ব্যাখ্যা দেন তা জানতে ইচ্ছে হয়।

ভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে বিশ্বনেতৃত্বের দুর্বলতা (অথচ নেতারা মনে করেন ওসবই শক্তির আকর) বিচার করা যাক। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে দু'টো মহাযুদ্ধ হয়ে গেলো। তাতে রক্ত ও ধ্বংসের বন্যা বইল। কিন্তু নেতাদের বোধোদয় হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর যুদ্ধমুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলার মহান চেতনা নিয়ে 'লীগ অব ন্যাশন্স' প্রতিষ্ঠিত হলো। মানুষের মনে কত আশা, কত ভরসা দানা বাঁধতে থাকলো। আর বুঝি রক্তারক্তি নয়, নয় আর ইতিহাসকে কলংকিত করা। মানুষ তার হীনত্বকে মহত্বের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে দিবে না, সে যুদ্ধের দাবানলে আর জ্বলবে না। শান্তিই হবে তার সদা সাথী। বড়ই বেদনাদায়ক যে, এ সংস্থা তিন দশকের হায়াতও পেলো না। আবার বিশ্ব-যুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) বেধে গেলো। চতুর্দিকে রক্ত আর রক্ত। ধবংস আর ধ্বংস! প্রথম মহাসমর স্থায়ী হয় প্রায় চার বছর আর দ্বিতীয়টি প্রায় ৬ বছর। তাছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি ও প্রসারের ফলে প্রথম মহাসমরের চেয়ে ২য় মহাসমরে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ অনেক বেশী বেড়ে যায় ও মারাত্মক রূপ নেয় এবং নিপুণতার সাথে সমাধা হয়। এক পরাশক্তি (আমেরিকা) অপর আর এক পরাশক্তির (জাপান) উপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ করলো। নিমিষে হিরোশিমার ধ্বংস লীলা সব ছাড়িয়ে চরম সীমায় উপনীত হলো– যাকে বলা হয় সর্বগ্রাসী ধ্বংস বা 'টোটাল ডেষ্ট্রাকশন'। নাগাসাকি শহরকেও একই দুর্ভাগ্যে পড়তে হয়। এ যেন 'কেয়ামতের' ক্ষুদ্র সংস্করণ। এর

ক্ষতিকর বহুদিক এখনও এ দু'টো শহরে ক্রিয়াশীল রয়েছে। আধুনিক যুদ্ধকে কোন এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। জল-স্থল-অন্তরীক্ষে চলে এ ধ্বংসের লীলাখেলা। এর গ্রাস থেকে নিষ্পাপ শিশুরাও নিস্তার পায় না। গাছ-বৃক্ষ, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ কোন কিছুই রেহাই পায় না। এতে মানবতাবোধের শেষবিন্দুটিও নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন বুদ্ধিমান মানুষের মন-মানসিকতা সব চলে যায় দুর্বুদ্ধির দখলে। দীর্ঘকালের জন্য পরিবেশ হয় ক্ষত-বিক্ষত। এসব কর্মকান্ডের হোতারা তো হন নেতারই। তারা নিজেরাই শুধু বিপথগামী হন না, জনগণকেও বিভ্রান্তিতে মাতিয়ে তোলেন ও অন্ধ অনুগামীতে পরিণত করেন। তাদের মত-ই জনমতের রূপ ধারণ করে। যদি তা সুস্থ ও কল্যাণের হতো তবে ভাবনার কিছু ছিল না। যাক সে কথা। আবার শান্তির পথে পা বাড়ালেন নেতারা। এবার প্রতিষ্ঠা হলো 'জাতি সংঘ'। এর কার্যক্রমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানবীয় বিষয় স্থান পেলো। অপরদিকে পরাশক্তিগুলোর মোড়লিপনা আরো মজবুত, আরো নিরংকুশ করার জন্য জাতি সংঘের ব্যবস্থাপনায় এমন কিছু বিধান সংযুক্ত হলো যা ঐ সংঘকে তাদের তাবেদারে পরিণত করেছে। তাতে গণতন্ত্রের প্রবক্তারাই গণতন্ত্রের কবর খোদলেন। এই সংস্থার জন্য নির্দ্ধারিত চাঁদা আদায়ে যতই গরিমসি করুক না কেন মোড়লিপনা বজায় রাখতে কোনই কমতি নেই। 'ভেটোর' অধিকার, নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসন তাদেরই উচ্চস্বরে উচ্চারিত মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের মূলে মরণ-আঘাত হেনে চলেছে। পারমাণবিক শক্তিকে ৫টি পরাশক্তির মাঝে সীমিত রাখার মতলব যে অবিশ্বাস ও অনাস্থা বাড়াচ্ছে তা বুঝতে খুব একটা বুদ্ধি খরচের কথা নয়। ভারত ও পাকিস্তানের পারমাণবিক বিস্ফোরণ এসবেরই বহিঃপ্রকাশ। অথচ সব রাষ্ট্রেরই একান্ত উচিত সর্বপ্রকার মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্র ধ্বংস করার পরিকল্পনা যথাসত্বর কার্যকর করা। সময় দ্রুত হাতছাড়া হচ্ছে। পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে এ পথে অগ্রসর না হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাওয়া বিচিত্র নয়। যদি এমনটি ঘটে তবে তা সমগ্র বিশ্বের জন্যে চূড়ান্ত দুর্দিন ও দুর্যোগের কারণ হবে। নেতাদের হৃদয়ে সুবুদ্ধির উদয় হউক, সত্বর অবস্থার উন্নতি হউক দরদেদিলে আমরা এই কামনা করছি। (চলবে)

– মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

বাইবেলের শিক্ষা ও খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস

তৃতীয় কিস্তি

৬. বাইবেল প্রায়শ্চিত্তবাদ স্বীকার করে না

খ্রীষ্টানদের মূল বিশ্বাস ত্রিত্ববাদের কোন প্রমাণ যেমন বাইবেলে পাওয়া যায় না। তদ্রুপ প্রায়শ্চিত্তবাদের বিশ্বাসও তাদের ধর্মগ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত হয় না। খ্রীষ্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, মানুষের পাপ বহন করার জন্য যীশু ক্রুশে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু বাইবেল এর বিপরীত কথা বলে। যেমন, বাইবেলে আছে, "যে প্রাণী পাপ করে সে-ই মরিবে, পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না ও পুত্রের অপরাধ পিতা বহন করিবে না; ধার্মিকের ধার্মিকতা তাহার উপর বর্তিবে ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহার উপর বর্তিবে। অধিকন্তু দুষ্ট লোক যদি আপনার কৃত সমস্ত পাপ হইতে ফিরে ও আমার বিধি সকল পালন করে এবং ন্যায় ও ধর্মাচারণ করে তবে সে অবশ্য বাঁচিবে" (যিহিষ্কেল ১৮ঃ২০)। এখানে যেমন যার পাপ তাঁকেই বহন করার কথা বলা হয়েছে তেমন পাপের শাস্তি হতে রক্ষা পাবার জন্য কোন প্রায়শ্চিত্তবাদ নয় পাপীকেই নিজ প্রচেষ্টা দ্বারা তা হতে রক্ষা পেতে হবে। এরূপ বিধান বর্তমান থাকতে যীশু কীভাবে অন্যের পাপ বহন করার জন্য নিজের জীবন দিতে পারেন ? প্রায়শ্চিত্তবাদকে স্বীকার করার পূর্বে পুরাতন নিয়মের উপরোল্লেখিত বিধানকে লোপ করতে হবে। কিন্তু যীশু নিজেই বলেছেন, "মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদী গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি, আমি লোপ করিতে আসি নাই কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। কেননা, আমি তোমাদেরকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে" (মথি ৫:১৭-১৮)। এ কারণেই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যীশু নিজেই শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়া দিয়াবল ও যিহুদীদের অভিযোগ খন্ডন করেছেন। অতএব শাস্ত্র যখন বলছে, "যে প্রাণী পাপ করিবে সে-ই মরিবে" সে ক্ষেত্রে যীশু কীভাবে অন্যের পাপ নিজের স্কন্ধে নিয়ে অভিশপ্ত মৃত্যু বরণ করলেন?

অতএব স্ত্রীলোকের গর্ভে মর্ত্ত্য বা মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করায় বাইবেলের শিক্ষানুযায়ী যীশু জন্মগতভাবে পাপী। কেননা, বাইবেল বলে, "মর্ত্ত্য কি যে, সে পবিত্র হইতে পারে? অবলা জাত মনুষ্য কি ধার্মিক হইতে পারে?" (ইয়োব ১৫ঃ১৪)। যীশু নিজেও বলেছেন, "যীশু তাহাকে কহিলেন, আমাকে সৎ কেন বলিতেছ? একজন ব্যতিরেকে সৎ আর কেহ নাই, তিনি ঈশ্বর" (মার্ক ১০ঃ১৮)। যে নিজেই পাপী সে কীরূপে অন্যের পাপ বহন করবে? যীশু নিজেও বলেছেন, "অন্ধ কি কখনও অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে?" (লুক-৬ঃ৩৯)। অতএব প্রায়শ্চিত্তবাদের বিশ্বাসও বাইবেল বিরোধী।

যীশুর ক্রুশারোহণ ও মৃত্যু, যা খ্রীষ্টানগণ বিশ্বাস করেন। যদি ইচ্ছাকৃতই হবে তবে যীশু পিতাকে কেন বলেছিলেন, "যদি আমার রাজ্য এ জগতে হইত তবে আমার অনুচরেরা প্রাণপণ করিত যেন আমি ইহুদীদের হস্তে সমর্পিত না হই" (যোহন ১৮ঃ৩৬)। এবং কেনইবা বন্দি হবার পূর্বে ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন, "আব্বা, পিতঃ" সকলই তোমার সাধ্য; আমার নিকট হতে এই পান পাত্র দূর কর; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক" (মার্ক ১৪ঃ৩৭)। এখানে যীশু তার বন্দীত্ব রূপ পান পাত্রকে তার ইচ্ছামত নয় বলেছেন, আবার যখন যিহুদীগণ তাঁকে ক্রুশে লটকিয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন, "এলী এলী লামা সবক্তানী অর্থাৎ ঈশ্বর আমার ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছো" (মথি ২৭ঃ৪৬)। যদি যীশুর বন্দী ও ক্রুশারোহণ স্বেচ্ছায় না হয় তবে তাঁর ক্রুশে মৃত্যুবরণ স্বেচ্ছায় কীরূপে হল?

৭. যীশু ক্রুশে মারা যান নাই

বাইবেলে যীশুর ক্রুশারোহণ অধ্যায় মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করলে দেখা যায় যে, যীশুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ক্রুশে লটকালেও যীশুর প্রার্থনানুযায়ী ঈশ্বর তাঁকে ক্রুশের অভিশপ্ত মৃত্যু হতে রক্ষা করেন। যদি প্রকৃতই যীশুর ক্রুশে মৃত্যু হত, তবে তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তি নন রলে প্রমাণিত হত, কারণ তখন ঈশ্বর যীশুর প্রার্থনা শুনেন

নি বলে সাব্যস্ত হত। যীশুর ক্রুশে লটকানোবস্থায় তাঁর প্রার্থনা শুনে যীহুদীগণ বলেছিল, " যাক, দেখি এলীয় তাকে রক্ষা করতে আসে কি না" (মথি ২৭ঃ৪৯)। যদি তিনি সত্যই ক্রুশে মারা যেতেন তবে কি এটাই প্রমাণিত হত না যে, ঈশ্বর যীশুকে রক্ষা করতে পারেন নি? বাস্তবে যীশু ক্রুশে মারা যান নি বরং মৃতবৎ হয়েছিলেন যীশু ক্রুশারোহণের পূর্বে তার শিষ্যদের বলেছিলেন, "এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকে চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনা ভাববাদীর চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে না। কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিলেন তেমনি মনুষ্য-পুত্রও তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন" (মথি ১২ঃ৩১-৪০)। যোনার দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, তিনি তিন দিবারাত্র তিমি মাছের উদরে মৃতবৎ ছিলেন, মৃত হিসাবে ছিলেন না, যীশু ও যোনার ন্যায় তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে অর্থাৎ কবরে মৃতবৎ থাকবেন বলেই শিষ্যদের বলেছিলেন, মৃত হিসাবে নয়। অতএব যীশু যদি সত্যই মারা যেতেন তবে যোনা ভাববাদীর দৃষ্টান্ত তাঁর ভিতর থাকত না। ক্রুশে লটকানোর পরবর্তী ঘটনা পর্যালোচনা করলেও এর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

ক্রুশে লটকানোর পর সাধারণতঃ যতক্ষণ রাখলে মানুষের মৃত্যু হয়, বিশ্রাম বার থাকার কারণে ঐ দিন ক্রুশে লটকানো ব্যক্তিদের তৎপূর্বেই ক্রুশ হতে নামাবার জন্য ফরিশীগণ পীলাতকে অনুরোধ করে এবং যেহেতু নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তাদের নামান হচ্ছিল সুতরাং ফরিশীগণ পীলাতকে সকলের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য তাদের পা ভেঙ্গে দিতে অনুরোধ করে (যোহন ১৯ঃ৩১)। ঐ দিন যীশুর সহিত আরও দু'জনকে ক্রুশে লটকানো হয়। সৈন্যগণ যীশু ব্যতীত অন্য দু'জনের পা ভাঙ্গে। কিন্তু যীশুকে মৃত মনে করে তার পা ভাঙ্গে নি (ঐ ১৯ঃ৩২-৩৩)। যীশুকে যখন ক্রুশে লটকানো হয় তখন তিনি ৩৩ বৎসরের যুবক। তাঁর স্বাস্থ্যও দুর্বল ছিল না। এরূপ একজন লোকের পক্ষে সামান্য সময় ক্রুশে থাকার কারণে মৃত্যু হতে পারে না। এজন্য যীশুকে মৃত বলায় পীলাতও আশ্চর্য হয়েছিলেন (মার্ক ১৫ঃ৪৪)। বস্তুতঃ ক্রুশে লটকানোর পর যীশু পিপাসার্ত হওয়ায় তাঁকে সিরকা পান করানো হয়। সিরকার মাদকতায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ার কারণে তার মাথা নত হয়ে পরায় সবাই তাঁকে মৃত মনে করে (যোহন ঃ ২৮-৩০)। তিনি যে জীবিত ছিলেন যোহন ১৯ঃ৩৪ শ্লোক হতেও তার প্রমাণ মেলে। যেখানে বলা হয়েছে, "কিন্তু একজন সেনা বর্শা দিয়া তার কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করিল, তাতে অমনি রক্ত ও জল বাহির হইল" (যোহন ১৯:৩৪)। রক্ত জীবনী-শক্তির চিহ্ন। কোন মৃত ব্যক্তির দেহ হতে রক্ত বের হয় না। যীশুর মৃতবৎ অবস্থার কারণেই তাঁর শরীর হতে রক্ত বের হয়েছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, যখন যীশুকে ক্রুশ হতে নামান হয় তখন তাঁর মৃত্যু হয় নি। যোহনের ১৯ ঃ ২৮-৩৭ শ্লোকসমূহ পাঠ করলেই সত্য অবগত হওয়া যাবে। যীশু যে ক্রুশে মরেন নি তার আরও প্রমাণ বাইবেল হতেই পাওয়া যায়। যেমন, বাইবেলে একস্থানে বলা হয়েছে, "যখন তারা শুনিলেন যে, তিনি জীবিত আছেন ও তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন তখন অবিশ্বাস করিলেন" (মার্ক ১৬ঃ১১)। যীশু কবর হতে উত্থিত হবার পর প্রথম মগ্দলীনী মরিয়মকে দর্শন দেন। তিনি যখন যীশুর শিষ্যদের জানালেন যে, যীশু জীবিত আছেন তখন শিষ্যগণ প্রথমে অস্বীকার করেন (ঐ ১৬ঃ৯-১১)। এখানে 'জীবিত আছেন' শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যীশু প্রকৃতপক্ষে ক্রুশে মারা যান নি। মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হলে, 'জীবিত আছেন' কথা ব্যবহৃত হত না। যীশু যে জীবিত ছিলেন তা কোন কোন শিষ্য জানতেন। মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোবের মাতা মরিয়ম ও শালোমী তাঁদের অন্যতম। এজন্যই তারা সুগন্ধি দ্রব্য ক্রয় করে তাঁকে মাখাবার জন্য তাঁর কবরে নিয়ে যান (ঐ ১৬:১)। মৃত্যু ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর কোন সুগন্ধি মাখানোর কোন প্রশ্নই উঠে না। মার্কের ১৬:১-৫ শ্লোক পাঠ করলে জানা যায় যে, কবরের ভিতরে তাঁকে মাখানোর জন্যই তারা গিয়েছিলেন, পুনরুত্থিত হবার পর নয়। অরিমাথিয়ার যোসেফ ও নীকদীমও জানতেন যে, যীশু মরেনি। যে জন্য তারা যীশুকে কবরে রাখার পূর্বে গন্ধরস্য ও অগুড়ের সহিত মসীনার কাপড় দিয়ে বাঁধেন। বাইবেলের অন্যত্র হতে জানা যায় যে, মসীনা আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে লাগালে ব্যথার উপশম হয়। যীশু যদি মারাই যাবেন তবে সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত মসীনা ব্যবহার করা হল কেন?

৮. মৃতদের ভিতর সুসমাচার প্রচার বাইবেল বিরোধী

খ্রীষ্টানগণ যেমন বিশ্বাস করেন যে, পাপীর পাপ বহন করার জন্য যীশু তিন দিনের জন্য মৃত্যুবরণ করেন, তদ্রূপ তারা এটাও বিশ্বাস করেন যে, এই তিন দিন তিনি মৃতদের ভিতর সুসমাচার প্রচার করেন। কিন্তু বাইবেল এরূপ বিশ্বাসের বিরোধী। পরন্তু বাইবেল বলে, "পাতাল তো তোমার স্তবগান করে না, মৃত্যু তোমার প্রশংসা করে না, গর্তগামীরা তোমার সত্যের অপেক্ষা করে না, জীবিত, জীবিত লোকই তোমার স্তবগান করিবে। আমি যেমন অদ্য করিতেছি, পিতা সন্তানগণকে তোমার সত্য জ্ঞাত করিবে" (যিশাইয় ৩৮:১৮-১৯)। বাইবেল যখন বলছে "গর্তগামীরা তোমার সত্যের অপেক্ষা করে না," তখন যীশু কেন গর্তগামী বা মৃতদের ভিতর সুসমাচার প্রচারের জন্য মৃত্যুবরণ করবেন? মৃতগণ যখন জীবিত ছিল তখন যে সকল ভাববাদী এসেছিলো, তাদের দ্বারাইতো ভাববাণী লাভ করেছিলেন? মৃত্যুর পর তো তারা বিচারের জন্য অপেক্ষ্যমান! তবে সুসমাচার প্রচারের দ্বারা তারা কীভাবে পরিত্রাণ পাবে? (চলবে)

– খোন্দকার আজমল হক

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য
ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ
রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২
ফোনঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার
যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য
যোগাযোগ করুনঃ
সালমান
অস্থায়ী অফিস ঃ
৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১২০৫৯৭, ৯১১৮৭৪৯

ওয়াকেআতে শীরী

(আনন্দের ঘটনাবলী)

একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-পুস্তক

মূল : মির্যা খলীল আহমদ কমর

(পঞ্চম কিস্তি)

পিতার পুণ্যের কল্যাণ :

"আমার তো ধর্মীয়-বিশ্বাস এই যে, যদি একজন মানুষ বা-খোদা (খোদাকে লাভকারী) ও সত্যিকারের মুত্তাকী (খোদা-ভীরু) হয় তাহলে তার সাত-পুরুষের ওপরে পর্যন্তও খোদার কল্যাণ ও অনুগ্রহের হাত বিস্তৃত থাকে। আর তিনি বরং তাদেরকে হেফাযত করে থাকেন। একবার হযরত মূসা (আঃ) উপদেশমূলক বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তখন কেউ জিজ্ঞেস করলো, আপনার চেয়ে আরও কি কেউ অধিক জ্ঞানী আছেন? তখন তিনি (আঃ) বল্লেন, আমার জানা নেই। আল্লাহ্‌তাআলা এ কথাটি পসন্দ করলেন না। (অর্থাৎ তাঁর এভাবে বলা উচিত ছিলো যে, খোদার বান্দা তো অনেকই আছেন, যারা জ্ঞানে একজনের চেয়ে আরেকজন অধিক জ্ঞানী।) আর আদেশ হলো যে, তুমি অমুক স্থানে চলে যাও, যেখানে তোমার মাছ জীবিত হয়ে যাবে। সেখানে তোমার একজন জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎলাভ হবে। অতএব যখন তিনি সেখানে গেলেন তখন এক স্থানে মাছের কথা ভুলে গেলেন। যখন দ্বিতীয়বার অন্বেষণ করতে আসলেন তখন জানতে পারলেন যে, সেখানে মাছ নেই। তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। তখন আমাদের একজন বান্দার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। মূসা (আঃ) তাকে বল্লেন, আমাকে কি অনুমতি দিবেন যে, আপনার সাথে থেকে আমি জ্ঞান ও তত্ত্ব-জ্ঞান শিক্ষা করি? ঐ বুযর্গ বল্লেন, অনুমতি দিলাম, কিন্তু আপনি তো কু-ধারণা থেকে রক্ষা পাবেন না। কেননা, যে কথার মাহাত্ম্য জানা থাকে না এবং বুঝা যায় না ঐ বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করা কঠিন। কেননা, যখন দেখা যায় যে, এক উপলক্ষ্যে এক ব্যক্তি অসহনীয় কাজ করে তখন অধিকাংশ সময়ে কু-ধারণা সৃষ্টি হয়ে যায়। অতএব মূসা (আঃ) বল্লেন, কোন কু-ধারণা করবো না আর আপনার সাথী হবো। তিনি বল্লেন, যদি আমার সাথী হও তাহলে আমাকে কোন প্রশ্ন করতে পারবে না।

অতএব যখন পথ চলতে আরম্ভ করলেন তখন দুই এতীম বালকের একটি দেওয়াল দেখতে পেলেন যা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম ছিলো। এর নীচে গচ্ছিত ধন-সম্পদ ছিলো। বালকরাও ছিলো নাবালক। এ দেওয়াল পড়ে গেলে সম্পদ বের হয়ে লোকদের দখলে চলে যাবে এবং ঐ বেচারারা হৃতসর্বস্ব হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ্‌তাআলা এ দুই নবীকে এ সেবার জন্যে নিযুক্ত করেন এবং বলেন, এর মেরামত করো। তাঁরা গেলেন এবং দেওয়াল মেরামত করে দিলেন। যখন তারা (বালকদ্বয়) যৌবনে পৌঁছবে তখন যেন তারা ঐ সম্পদ বের করে খরচ করতে পারে।

খোদার এই দুই মহান ব্যক্তিকে সেখানে পাঠানোর কী কারণ ছিলো? এর এই কারণ ছিলো যে, **ওয়া কানা আবূহুমা সলিহান** অর্থাৎ এ বালকদের পিতা পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। পিতার পুণ্য ও যোগ্যতার জন্যে খিযর (আঃ) ও মূসা (আঃ)-এর ন্যায় মহান নবীদের মজদুর বানিয়ে দিলেন.....এথেকে জানা যেতে পারে যে, ঐ ব্যক্তির কী মর্যাদা ছিলো যেজন্যে আমরা তার সম্পদের হেফাযত করেছি যে, যখন তারা বড় হবে তখন তাদের হাতে তাদের সম্পদ এসে যাবে। আল্লাহ্‌তাআলার ইহা বলা থেকে আরও অবহিত হওয়া যায় যে, দু'টি বালকের জন্যে হযরত খিযর (আঃ) কষ্ট স্বীকার করলেন। আসলে তাদের চাল-চলন উত্তম ছিলো না। বরং সম্ভবতঃ ঐশী-জ্ঞানে তারা অসদাচরণ ও খারাপ অবস্থার শিকার হিসেবে পরিগণিত ছিলো। সুতরাং খোদাতাআলা স্বীয় সাত্তারী (ঢেকে রাখা) গুণের প্রকাশ হিসেবে তাদের চাল-চলনকে গোপনে রেখে তাদের পিতার যোগ্যতা প্রকাশ করে দিলেন এবং তাদের আসল অবস্থা, যা ভাল ছিলো না, প্রকাশিত করেন নি এবং এক আত্মীয়ের কারণে দুই এতীমের ওপরে দয়া করলেন।

দেখ! কোথায় এই কথা যে, আল্লাহ্‌তাআলা ঐ ব্যক্তির কারণে তার সন্তানদের প্রতি এতটা দৃষ্টি রাখলেন আর কোথায় ইহা যে, মানুষ নিমজ্জিত হয়ে চলছে। এতদ্দ্বারাও অবহিত হওয়া যায় যে, যে-লোক সর্বাবস্থায় খোদাতাআলার সাথে সংযোগ রাখে খোদাতাআলা তাদেরকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করেন।"

(এ ঘটনা মলফুযাত তৃতীয় খণ্ডে ৩৩৭ পৃষ্ঠায়, পঞ্চম খণ্ডের ২৩৫ পৃষ্ঠায়, ষষ্ঠ খণ্ডের ৬৮ পৃষ্ঠায় এবং মকতুবাতে আহমদের ৫ম খণ্ডের ২ ও ১১৫ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিবরণের পার্থক্যতা সহ লেখা আছে। এখানে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণকে একই স্থানে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে)।

দোয়ার শর্ত :

তাযকেরাতুল আওলীয়া পুস্তকে লেখা আছে যে, এক বুযর্গের নিকট কেউ দোয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলো। বুযর্গ বল্লেন, "দুধ ও চাল নিয়ে এস।" ঐ ব্যক্তি ঘাবড়িয়ে গেলেন। পরিশেষে সে নিয়ে আসলো। বুযর্গ দোয়া করলেন আর ঐ ব্যক্তির কাজ হয়ে গেল। পরিশেষে তাকে বলা হলো যে, ইহা কেবল সম্পর্ক সৃষ্টির জন্যে ছিলো। বাবা ফরীদ সাহেবের তাযকেরা-এর মধ্যে এ রকমই লেখা আছে যে, এক ব্যক্তির বিক্রয়ের দলীল হারিয়ে গেল। আর সে দোয়ার জন্যে তাঁর নিকট এসেছিলো। তখন তিনি বল্লেন, আমাকে হালুয়া খাওয়াও এবং ঐ দলীল হালুয়ার দোকানে পাওয়া গেল" *(মলফুযাত ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪)*।

দোয়ার অস্ত্র :

"বলা হয়ে থাকে যে, একবার এক বাদশাহ্ কোন দেশের ওপরে আক্রমণ করার জন্যে রওয়ানা হলেন। রাস্তায় একজন ফকীর তার ঘোড়ার লাগাম ধরে বসলেন এবং বল্লেন, তুমি সামনে অগ্রসর হয়ো না নচেৎ আমি তোমার সাথে যুদ্ধ করবো। বাদশাহ্ অস্থির হলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি এক নিঃস্ব ফকীর তুমি কীভাবে আমার সাথে যুদ্ধ করবে? ফকীর উত্তর দিলেন, আমি ভোর বেলার দোয়ার অস্ত্র দ্বারা তোমার মোকাবেলায় যুদ্ধ করবো। বাদশাহ্ বল্লেন, আমি এর মোকাবেলা করতে পারবো না। বাদশাহ্ ইহা বলে ফিরে চলে গেলেন" *(মলফুযাত ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭)*।

(অবশিষ্টাংশ ২৯ পাতায় দ্রষ্টব্য)

শেষ যুগের প্রতিশ্রুত ঐশী জামাত – আহমদীয়া জামাত

আল্লাহ্‌তাআলার এমন কোন নবী-রসূল ও প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ আগমন করেন নি যাঁর বিরোধিতা করা হয় নি এবং যাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ ও কুৎসা রটনা করা হয় নি। মসীহ্ নাসেরী এবং আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-ও এথেকে রেহাই পান নি। সুতরাং আল্লাহ্‌তাআলা আক্ষেপ করে বলেছেন – "ইয়া হাসরাতান আলাল 'ইবাদি মা ইয়া'তীহিম মির্‌রসূলিন ইল্লা কানূ বিহী ইয়াস্‌তাহযিউন" অর্থাৎ পরিতাপ ! বান্দাগণের জন্যে, তাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নি, যার প্রতি তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে নি *(সূরা ইয়াসীন ঃ ৩১ আয়াত)*। আহমদীয়া মুসলিম জামাত [একে বিকৃত করে বলা হয় 'কাদিয়ানী' অথচ বুযর্গান বলে গিয়েছিলেন যে, শেষ যুগে হেদায়াতপ্রাপ্ত জামাতের নাম হবে আহমদী জামাত-(মাবদা ওয়া মাআদ)]-এর প্রারম্ভ কাল থেকে এর বিরুদ্ধবাদী ও বৈরীগণ এ জামাত এবং এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে নানা প্রকার কুৎসা রটনা, অভিযোগ ও ঠাট্টা-মস্কারা করে আস্‌ছে। যথাসময়ে ও যথারীতি এর প্রত্যেকটির জবাব দিয়ে আসা হয়েছে। আমাদের বহু বই-পুস্তকে এগুলো দেখতে পাওয়া যাবে।

লন্ডন থেকে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা "নতুন দিন"–এর ২১-২৭ আগষ্ট '৯৮ সংখ্যায় "কাদিয়ানী চক্রান্ত অতীত ও বর্তমান" শীর্ষক মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম (সম্ভবতঃ ইনি আন্তর্জাতিক তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত, বাংলাদেশ-এর জেনারেল সেক্রেটারী)-এর একটি প্রবন্ধের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এর জবাব দিবার প্রয়োজন ছিলো না। কেননা, সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের জন্যে ঐশী ব্যবস্থানুযায়ী তাদের নেতা খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেবের সাথে আমাদের 'মুবাহালা' চলছে। যেহেতু সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে বিলেতে গিয়েও তিনি সেখানকার বাঙ্গালী ভাইদের মধ্যে আমাদের জামাতের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করছেন আর বিষ বাষ্প ছড়াচ্ছেন তাই এর জবাব লেখার প্রয়োজন মনে করছি।

মাওলানা সাহেব একতরফাভাবে তার কথাগুলো বলে গেছেন। কোন প্রকার রেফারেন্স বা দলীল প্রমাণ পেশ করেন নি। সুতরাং তার নিম্নোক্ত কতিপয় বক্তব্য আমরা একবারেই 'মিথ্যা' বরং ডাহা মিথ্যা বলে নাকচ করে দিতে পারি। আর আমরা-লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন-মিথ্যাবাদীদের ওপরে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত পাঠ করছি। সৎসাহস থাকলে তিনিও লানতের দোয়া পড়ুন এবং রেফারেন্স ও দলীল-প্রমাণ দিয়ে তার বক্তব্য প্রমাণ করুন ঃ

১। নবী করীম (সাঃ) 'যে আখেরী নবী একথা **পবিত্র কুরআনের শতাধিক আয়াত ও আড়াই শতাধিক বিশুদ্ধ হাদীস** দ্বারা সু প্রমাণিত।'

২। **'এই দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র** কাদিয়ানীদের সরকারীভাবে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা করেছেন।'

৩। 'কাদিয়ানী সম্প্রদায় (আহমদীয়া জামাত) নামটি **গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নাম** এবং **তার গ্রামের সাথে সম্পৃক্ত**।'

৪। **'১৮৪০ সালে** গোলাম আহমদ কাদিয়ানী..... জন্মগ্রহণ করেন।'

৫। 'গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর **মর্মান্তিক মৃত্যু** ঘটে।'

৬। তিনি **'শ্রেষ্ঠ নবী ও স্বতন্ত্র নবী হওয়ার দাবী করেন।'**

৭। **'ভারত থেকে জনৈক কাদিয়ানী মুসলমান আলেম বেশে ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রবেশ** করে এবং ভন্ড নবী গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর কায়দায় মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলে আর ধীরে ধীরে কাদিয়ানী মতবাদ আরম্ভ করে।'

৮। 'টাকা – পয়সার মাধ্যমে অনেক গরীব-দুঃখী মুসলমানদেরকে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা চালাচ্ছে।'

এখন আমরা মূল আলোচনায় যাচ্ছি। আহমদী জামাত ও এর বিরোধীদের মধ্যে প্রধানতঃ ৩টি বিষয়ে মতভেদ আর তা হলো (১) ঈসা আলায়হেস সালামের মৃত্যু, (২) খাতামান্নবীঈন রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরে উম্মতী নবীর আবির্ভাব এবং (৩) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ হিসেবে সত্যতা।

হযরত ঈসা মসীহ্ নাসেরী (আঃ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে কুরআন এবং হাদীসে বহু দলীল প্রমাণ রয়েছে। সেসব দলীল প্রমাণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। এ প্রসঙ্গে আমাদের পুস্তকাদি পাঠ করার অনুরোধ রাখছি। এখানে এ প্রসঙ্গে কয়েকজন বুযর্গের মতামত পেশ করছি। এতদ্‌দ্বারা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বুঝতে সক্ষম হবেন যে, বিষয়টিকে বিরুদ্ধবাদী ওলামায়ে কেরাম যেভাবে খেলো করে দেখেন বিষয়টি ততো খেলো করে দেখার নয় কেননা, কুরআন শরীফে তাঁর মৃত্যুর ঘোষণা রয়েছে। (১) সূরা আলে ইমরান ৫৬ ও ১৪৫ আয়াত (২) সূরা মায়েদা শেষ রুকু।

(১) মিশরের প্রাক্তন মুফতী ও কায়রোর আল্ আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর আল্লামা মাহমুদ সালতুত হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে বলেন ঃ

"কুরআন করীম ও পবিত্র সুন্নত-এর মধ্যে কোন এমন নির্ভরযোগ্য সুস্পষ্ট আদেশ নেই যা কিনা এ ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তি রচনা করতে পারে ও যদ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারে যে, ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তিনি এখন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করছেন" *(আল্ ফাতাওয়া–মজমুয়াঁ ফাতাওয়া আল্লামা মাহমুদ সালতুত দ্রষ্টব্য)*।

(২) মাওলানা মওদুদী সাহেবের "তরজমায়ে কুরআন মজিদ-এ (ফালাহ্-ই-আম ট্রাষ্ট কর্তৃক প্রকাশিত) সূরা মায়েদার ৫৭নং টীকায় (১৯০ পৃঃ) লেখা হয়েছে।

"--------- মসীহ্ (আঃ)-এর **মৃত্যুর পর** প্রথম তিনশ' বৎসর পর্যন্ত খৃষ্টান জগৎ এ ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলো।"

(৩) বাংলার বিখ্যাত আলেম মাওলানা আকরম খাঁ কুরআন মজীদের সূরা আলে ইমরানের তফসীরের ৩৯ নং টীকায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন।

(৪) শেখুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হক তাঁর গ্রন্থ বোখারী শরীফের ৫ম খন্ডের ২৯৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, –"মুহাম্মদ রসূল বটেন (কিন্তু তিনি মানুষ, তিনি খোদা নন) তাঁহার পূর্বে আরও অনেক রসূল আসিয়াছিলেন, যাঁহাদের **কেহই দুনিয়াতে চিরজীবী হন নাই সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে।**"

(৫) জনাব মুহাম্মদ আসাদ কর্তৃক কুরআনের তফসীর The Message of the Quran -এ সূরা মায়েদার ১১৬ নং আয়াতের **ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফায়তানী** অংশের তরজমা করতে গিয়ে লিখেছেন – Thou hast caused me to die অর্থাৎ তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে (পৃঃ ১৬৯)।

এ রকম আরও উদ্ধৃতি দেয়া যায়। স্থানাভাবে এথেকে বিরত থাকলাম। যারা ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু স্বীকার করেন না তারা কি কুরআনের শিক্ষার বিরোধী বিশ্বাস পোষণ করেন না ? তারা কি ঈসা (আঃ)-কে খৃষ্টানদের খোদার পুত্র বলার সাথে সহযোগিতা করছেন না?

হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর প্রমাণের পরে নবুওয়তের ব্যাপারে আলোচনা করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে জামাতে আহমদীয়া ও বিরুদ্ধবাদী মাওলানাদের মধ্যে একটি বিষয়ে মতৈক্য রয়েছে। উভয়েই বিশ্বাস করেন যে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরে ঈসা নবীউল্লাহ্ [মুসলিম শরীফের হাদীসে আগমনকারী ঈসাকে চার বার 'নবীউল্লাহ্' বলে উল্লেখ করেছেন আঁ হযরত (সঃ)] আগমন করবেন।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, বনী ইসরাঈলী ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্তাআলা চতুর্থ বা দ্বিতীয় আকাশে উঠিয়ে রেখেছেন। শেষ যুগে সেই ঈসাই আগমন করবেন উম্মতে মুহাম্মদীয়ার হেদায়াতের জন্যে। এর কোন দালীলিক ভিত্তি নেই।

আহমদীগণ বলেন, হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর নবুওয়তের দায়িত্ব পালন করে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। আখেরী যুগে যে 'নবীউল্লাহ্' ঈসা (আঃ) আগমন করবেন তিনি বাইরে থেকে আসবেন না। তিনি মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত থেকে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করে তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পাদন করার জন্যে আবির্ভূত হবেন। এখানে উল্লেখ থাকে যে, আহমদীগণ নবী করীম (সঃ)-কে খাতামান্নবীঈন বলে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে। **তাঁর (সঃ) পরে কোন শরীয়তধারী স্বাধীন স্বতন্ত্র নবী আসতে পারে না।** সূরা নিসার ৭০ আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ্ ও এই রসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর পূর্ণ আনুগত্যের ফলে আল্লাহ্তাআলা প্রদত্ত নেয়ামত ও পুরস্কারস্বরূপ মুসলিম উম্মতের মধ্যে সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহগণের ন্যায় নবীর আবির্ভাবও স্বীকৃত। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে আল্লাহ্তাআলা এরকম একজন উম্মতি নবী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। উম্মতী নবীর দরজা খোলা এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে আরও অনেক আয়াত আছে। **হযরত মির্যা সাহেব কখনও নিজেকে স্বাধীন স্বতন্ত্র ও শরীয়তধারী নবী দাবী করেন নি।** এ রকম দাবী করাকে আমরা কুফরী বলে মনে করে থাকি।

আহমদীগণ মনে করেন উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সংশোধনের জন্যে অন্য ধর্ম থেকে কারও আসা মুহাম্মদ (সঃ)-এর মর্যাদার জন্যে হানিকর। যদি কাউকে আসতে হয় তবে তাঁর উম্মত ও গোলামদের মধ্য থেকেই আসতে হবে। হাদীসে – 'ফা ইমামুকুম মিনকুম' ও 'ফা আম্মাকুম মিনকুম' বলে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

নবুওয়তের ব্যাপারে আহমদী জামাত যে ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ করে, একই বিশ্বাস পোষণ করতেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) যাঁর সম্বন্ধে নবী করীম (সঃ) বলেছেন যে, ধর্মের অর্ধেক জ্ঞান তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা করো। তিনি বলেছেন - কুলূ আন্নাহু খাতামাল আম্বিয়ায়ে ওয়ালা তা'কলূ লা নাবীয়া বা'দাহূ অর্থাৎ তোমরা তাকে খাতামাল আম্বিয়া বলো কিন্তু তাঁর পরে নবী নেই এ কথা বলো না (দুররে মনসূর, তকমেলা মাজমাউল বেহার)। হযরত মুল্লা আলী কারী (রহঃ), মৌলানা মুহাম্মদ কাশেম নানুতবী (রহঃ), শেখুল আকবর মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহঃ) প্রমুখ আরও অনেক বুযর্গও এই বিশ্বাস পোষণ করতেন। একই ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ করে যদি আহমদীগণ কাফের সাব্যস্ত হন তাহলে উপরোক্ত সর্বজনমান্য বুযর্গানের বেলায় মাওলানা নুরুল ইসলাম সাহেবরা কী ফতওয়া দিবেন ?

মাওলানা নূরুল ইসলাম সাহেব ধর্মের নামে রাজনীতি করেন। তাই তিনি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বৃটিশদের কুপরামর্শে নবী দাবী করেছেন বলে মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। তারা আরও বলেন, তিনি নাকি ইংরেজদের দালাল ছিলেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হলো ঃ

(ক) এ উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকেই খৃষ্টান পাদরীরা হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের উপর মিথ্যা ও কল্পিত অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে অগণিত পুস্তক ও প্রচারপত্র ছড়িয়ে দিচ্ছিল। পাদরীগণ বাজারে-বন্দরে, অলিতে-গলিতে ব্যাপক প্রচার চালিয়ে কয়েক বৎসরের মধ্যে উপমহাদেশে খৃষ্টানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলো। এসব পাদরীর ধূর্ততার শিকার হয়ে এ উপমহাদেশে প্রায় ১৩ লক্ষ মুসলমান মুর্তাদ হয়ে ত্রিত্ববাদের ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এদের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট আলেম ও সৈয়্যদ বলে কথিত ব্যক্তিবর্গও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মুসলমানদেরকে এ দুর্বিষহ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করার জন্যে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) আত্ম নিয়োগ করলেন। তাঁর সাধনার যুগান্তকারী রূপায়ণ হচ্ছে 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি ইসলামের সত্যতা প্রতিপন্ন করেন এবং খৃষ্টান পাদরীদের ইসলাম বিরোধী মিথ্যা প্রচার অকাট্য দলিল-প্রমাণের সাহায্যে খন্ডন করেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) তাঁর ৮০/৯০ খানা গ্রন্থে খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদের অসারতা প্রমাণ করেছেন। তিনি খৃষ্টানদের খোদার পুত্র তথাকথিত খোদাবন্দ খোদা ঈসা ইবনে মরিয়মকে মৃত প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর কবর রয়েছে কাশ্মীরের শ্রীনগরে খান ইয়ার মহল্লায়। খৃষ্টান ইংরেজ শাসকরা কি এতই আহম্মক ছিল যে, তারা এমন ব্যক্তিকে তাদের ধর্মীয় দালাল নিয়োজিত করলো যিনি তাদের খোদাকেই মৃত সাব্যস্ত করলেন ? বরং খৃষ্টান ইংরেজ শাসকদের দালালতো ঐ সকল আলেম-ওলামা যারা আজও হযরত ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে আকাশে জীবিত আছেন বলে বিশ্বাস করেন। কেননা, এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ কুরআন বিরোধী। এরাইতো সেই সকল আলেম যারা খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসকে আরো জোরদার করছেন। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) অবশ্য এ উপমহাদেশে ইংরেজ শাসকদের প্রশংসা করেছিলেন। এ প্রশংসার আসল কারণ জানতে হলে ঐ যুগের অবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে। ঐ যুগ ছিল এমন এক যুগ যখন মুসলমানেরা শিখদের দ্বারা জীবনের সকল অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছিলো। শিখ শাসকরা মুসলমানদের জন্য আযান দেয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসকরা এ দেশে এসে ধর্মীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তাই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইংরেজ শাসকদের প্রশংসা করেছিলেন। তিনি কোন খোশামোদের উদ্দেশ্যে ইংরেজদের প্রশংসা করতেন না। বরং ইহা ইসলামী শিক্ষানুযায়ী উপকারীর উপকার স্বীকার করার দায়িত্ব পালন। তাই

তিনি (আঃ) বলেন ঃ

"অতএব, হে নির্বোধেরা ! শুন, আমি এ সরকারের কোন খোশামোদ করি না। বরং আসল কথা এই যে, এরূপ সরকার, যারা দীন-ইসলাম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোন হস্তক্ষেপ করে না এবং নিজেদের ধর্মের উন্নতির জন্যও আমাদের উপর তলোয়ার চালায় না, কুরআন শরীফের আলোকে তাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করা হারাম। কেননা, তারাও কোন ধর্মীয় যুদ্ধ (জেহাদ) করে না' *(কিশ্‌তিয়ে নূহের টীকা, পৃষ্ঠা-৬৮)*।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তো ইংরেজ শাসকদের প্রশংসা করেছিলেন ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী। কিন্তু এখন শুনুন তথাকথিত মর্দে মুজাহিদগণ ইংরেজ শাসকদের প্রশংসা ও খোশামোদ-তোশামোদ করতে গিয়ে কোন্ পর্যায়ে নেমে গিয়েছিলেন। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে কবি ডক্টর মুহম্মদ ইকবাল একটি শোকগাঁথা লিখেছিলেন। এতে তিনি যা বলেন তার বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

"সম্রাজ্ঞীর লাশ উঠেছে। সম্মান দেখানোর জন্য যে পথে লাশ যাবে সে পথের ধূলা হয়ে ইকবাল তুমি পড়ে থাক। অবস্থা তো তাই। নামে কি আসে যায় ? আমি তোমাকে মুহার্‌রম মাসের নাম দিচ্ছি!"

কবি ইকবাল আরো বলেন ঃ

"হে ভারতবর্ষ, তোমার মাথার উপর হতে খোদার ছায়া উঠে গেছে। তিনি তোমার অধিবাসীদের এক দরদী ছিলেন। তিনি (অর্থাৎ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া) চলে গেলেন। তাঁর জন্য খোদার আরশ টলে যায়। কান্নাতো এর জন্যই। ভারতের সৌন্দর্য যাঁর মধ্যে ছিল এ তো তাঁর মৃতদেহ।"

ইনিই হচ্ছেন মর্দে মুজাহিদ ডক্টর মোহাম্মদ ইকবাল, যিনি আহমদীয়তের বিরুদ্ধাচরণেও শীর্ষস্থানীয় বলে গণ্য ছিলেন। সুধী পাঠকগণ ! এখন বিচার করুন কে ইংরেজ শাসকদের দালাল ছিল ?

ইংরেজ শাসন সম্পর্কে এখন মাওলানা নূরুল ইসলাম সাহেবদের গুরু আর এক মর্দে মুজাহিদ আহলে হাদীস নেতা মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী সাহেবের অভিমত শুনুন। তিনি লেখেন ঃ

"রোমের সুলতান একজন ইসলামী বাদশাহ্। কিন্তু সাধারণ শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও সুশাসনের দিক থেকে (ধর্মকে বাদ দিয়ে) বৃটিশ সরকারও আমাদের স্বজাতি মুসলমানদের জন্য কোন কম গৌরবের কারণ নয় এবং বিশেষভাবে আহলে-হাদীস সম্প্রদায়ের জন্য তো এ ধরনের শান্তি-শৃংঙ্খলা ও স্বাধীনতার দিক হতে বর্তমান সময়ে সমগ্র ইসলামী সুলতানদের (রোম, ইরান, খোরাসান) চেয়েও অধিক গর্বের কারণ" (ইশায়াতুস সুন্নাহ্ পত্রিকা, ১০ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা. ২৯২-২৯৩)। এ প্রসঙ্গে আরও দেখুন। (ইশায়াতুস সুন্নাহ পত্রিকা, ১০ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা. ২৯২-২৯৩)

প্রকৃতপক্ষেই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইংরেজদের প্রশংসা করেছেন এবং একাধিকবার করেছেন। কিন্তু তিনি প্রত্যেক জায়গায় এ কথা বলেছেন যে, আমি এ জন্যে ইংরেজদের প্রশংসা করি যে, ভারতের মুসলমানদের বিশেষভাব পাঞ্জাবের মুসলমানদের দুরবস্থা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছিল যে, তাদের কোন অধিকারই আর অবশিষ্ট ছিল না। শিখ শাসকেরা এরূপ যুলুম-নির্যাতন করেছিল যে, এর কোন দৃষ্টান্ত অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। ইংরেজ শাসকগণ এসে এ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হতে মুসলমানদের বের করলেন এবং তাদের সকল অধিকার বহাল করলেন। এ কারণেই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইংরেজ শাসনের প্রশংসা করতে বাধ্য হন। কেননা, এটা কেবলমাত্র নবীগণের সুন্নতই নয় বরং সাধারণ মানবিক সৌজন্যেরও তাকিদ যে, অনুগ্রহকে অনুগ্রহের সাথে স্মরণ করতে হয়। একে কি দালালী বলা যেতে পারে ?

মাওলানা নূরুল ইসলাম সাহেব ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে হাদীসের বরাত দিয়ে বলেছেন যে, "তিনি ফাতেমা (রাঃ)-এর বংশ থেকে জন্মগ্রহণ করবেন। তার নাম হবে মুহাম্মদ, মায়ের নাম হবে আমেনা এবং পিতার নাম হবে আব্দুল্লাহ্।" মাওলানা সাহেব এর কোন রেফারেন্স দেন নি। মওলানা সাহেবকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিনে মক্কায় পবিত্র বায়তুল্লাহ্‌র পার্শ্বে দাঁড়িয়ে মুহাম্মদ নামে যে ব্যক্তিটি, যার পিতার নাম আব্দুল্লাহ ছিলো এবং মাতার নাম ছিলো আমেনা, ইমাম মাহদী দাবী করেছিলো তাকে আপনারা কেন গ্রহণ করেননি ? সৌদী সরকার মসজিদুল হারামে রক্তপাত ঘটিয়ে কেন তাকে এবং তার দলবলকে বিনাশ করে দিয়েছিলেন ?

মাওলানা সাহেব জেহাদের বিষয়েও মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। জেহাদের প্রসঙ্গে আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই যে, আমরা জেহাদকে ফরয বলে বিশ্বাস করি এবং আহমদী জামাত সারা বিশ্বে প্রতিনিয়ত জেহাদে কবীর ও জেহাদে আকবর করে যাচ্ছে। তবে মাওলানা সাহেব জেহাদ অর্থ যদি যুদ্ধ মনে করে থাকেন যাকে নবী করীম (সঃ) জেহাদে আসগর বা ছোট জেহাদ বলেছেন, তাহলে তা নবী করীম (সঃ)-ই রদ করে গেছেন। তিনি (সঃ) বলেছেন যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম জেহাদকে রহিত করবেন, কোন কোন বর্ণনায় জিজিয়া কর রহিত করবেন (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)। সুতরাং মির্যা সাহেব অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ ধরনের জেহাদকে রহিত ঘোষণা করেছেন। আত্মশুদ্ধির জেহাদ (জেহাদে আকবর) এবং কুরআন প্রচারের জেহাদ (জেহাদে কবীর) রহিত করেন নি তিনি। জেহাদ রহিত করার জন্যে মির্যা সাহেবকে দোষারূপ করা অন্যায় নয় কি ? মাওলানা সাহেব যদি জেহাদকে যুদ্ধ অর্থে মনে করেন তবে তিনি বা তার দলের লোকেরা কবে কোথায় কোন্ কোন্ জেহাদে অংশ গ্রহণ করেছেন, বলবেন কি ? আমরা তো জানি তাদের জেহাদ কেবল আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নিরীহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে।

পরিশেষে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, অযথা কুফরী ফতোয়া ও ফেতনা ফাসাদের পথ অবলম্বন না করে সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের জন্যে হযরত মির্যা সাহেবের পুস্তকগুলি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করুন ও নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতি গ্রহণ করুন ঃ

(১) দোয়া ইস্তেখারার মাধ্যমে, যেভাবে মির্যা সাহেব (আঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট জানতে চান হযরত মির্যা সাহেব সত্য কি মিথ্যা ?

(২) হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) সাহেব প্রদত্ত মুবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন। জাতিগতভাবে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের ইহাও একটি ঐশী-পদ্ধতি যখন কিনা বিরুদ্ধবাদীরা কোন দলীল প্রমাণ দেখতে চায় না বরং মিথ্যারোপে ও কুৎসা রটনায় অত্যধিক বেড়ে যায়।

আমরা দোয়া করি আল্লাহ্‌তাআলা সকলকে সঠিক পথ লাভের সৌভাগ্য দান করুন।

– সাহেবুল কাহ্‌ফ

"যে সময় কোন ব্যক্তি কোন নামাযকে ছেড়ে দেয় সে সময়ই সে আহমদীয়ত থেকে বের হয়ে যায়"।
[হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ), আল্ ফযল ঃ ৭ই জুন, ১৯৪২ খৃঃ]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বহু দিন যাবৎ চিন্তা করে আসছিলাম কিছু একটা লিখব। সময়ের অভাবে লিখতে পারিনি। ইদানিং আমার অতি সুপ্রিয় বন্ধু যিনি বড়ই বুযর্গ ও সুলেখকও বটেন, আমাকে খুব আন্তরিকতার সাথে লিখার উপদেশমূলক তাগিদ করেন, জাযাহুমুল্লাহ্।

এই তো সেদিন আহমদীয়া মুসলিম জামাত ময়মনসিংহের মসজিদ সংলগ্ন স্থানটুকুর খাজানা দিবার জন্য স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ময়মনসিংহ তহশীল অফিস যাই। অফিসের তহশীলদার সাহেব আমাকে অতি বিনম্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "মৌলভী সাহেব, আহমদী ও অ-আহমদীর মধ্যে পার্থক্য বা ব্যবধান কি"? আমি মৃদু হেসে বল্লাম, "জনাব, আমি নিজেও এক সময় আহমদী ছিলাম না মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ অবস্থাতেই একটি মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হই। বহুদিন ইমামতি করি ও আমার ক্ষুদ্র প্রচষ্টায় একটি মাদ্রাসাও গড়ে তুলি। আমার ঈমানের দৃঢ়তা নিয়ে বলতে পারি, পূর্বে যে কলেমা তাইয়্যেবা ও কলেমা শাহাদত পড়েছি এখনও সেই কলেমাই পড়ি। নামায পাঁচ বারই পড়ি, সেই **ইন্নি ওয়াজজাহ্তু** হতে শুরু করে **আত্তাহিয়্যাতু সহ দরূদ ও দোয়া মাসূরা** পর্যন্ত পূর্ববৎ সকল তসবীহ সূরা ফাতিহা ও পবিত্র কুরআনের সূরাসমূহ পড়ি, রোযাও পবিত্র রমাযান মাসেই রাখি, অনুরূপ কুরবানী ও সামর্থ্য অনুযায়ী হজ্জ ও যাকাত অর্থাৎ ইসলামের যাবতীয় রুকনগুলি যথাসাধ্য পালন করে আসছি ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপ সাকল্যই করতে হয়। এদিক দিয়ে কোন পার্থক্য আছে বলে আমার জানা নেই।"

তহশীলদার সাহেব বলেন, তবে কি জন্য মৌলভী সাহেবান আপনাদের বিরুদ্ধে এত বৈরীভাব পোষণ করেন ও এত হৈ হল্লা এবং আন্দোলন করেন? এই সময় অফিসে ২ জন মৌলভী সাহেব ও ১ জন হাজী সাহেব সহ প্রায় ১৬/১৭ জন লোক বসা ছিলেন। তহশীলদার সাহেব আমাকে প্রশ্ন করায় সকলেই নীরব হয়ে আমাদের কথাগুলি শুনছিলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে আমি বল্লাম, "মৌলভী সাহেবানের বৈরী ভাবের ব্যাপারে মৌলভী সাহেবানই ভাল জানেন।" তিনি উত্তরে বল্লেন, আপনার জানা মতে কিছু বলেন শুনি। আমি বল্লাম, "শ্রদ্ধেয়! আমার ভয় হয় যদি আমি বিষয়টি উদ্‌ঘাটন করতে যাই তবে হয়ত আপনি মনে কষ্ট পেয়ে আমার প্রতি নারাজ হয়ে যাবেন"। তিনি বল্লেন, "নারাজের কি আছে, সত্য বলবেন এর মধ্যে কে খুশী হবে বা কে নারাজ হবে এই চিন্তা করবেন না।" তাঁর এই আশ্বাস পেয়ে আমি বলতে শুরু করি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তাআলা বলেনঃ-

"ওয়ামা আতাকুমুর রসূলু ফাখুজুহু ওয়ামা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু" (৫৯ঃ৮) অর্থাৎ, এবং রসূল (সঃ) যা দান করে উহা গ্রহণ করা এবং যা হতে তোমাদিগকে নিষেধ করে উহা হতে তোমরা বিরত থাক।"

পবিত্র কুরআন আরও বলে – "ক্কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি----ওয়াল্লাহু গফুরুর রহীম" (৩:৩২)।

অর্থাৎ তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তা হলে তোমরা আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভালবাসবেন --------- আর আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ আরও বলেন, "ক্কুল আতিউল্লাহা ওয়ার্‌রসূলা ফাইন তাওয়াল্লাও ফাইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বুল কাফিরীন।" অর্থাৎ তুমি বল, আল্লাহ ও এই রসূলের আনুগত্য কর কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে লও তা হলে (জানিও) আল্লাহ্ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না (৩:৩৩)।

সুপ্রিয় ভ্রাতা! পবিত্র কুরআনের আলোকে আমরা সত্য ও মিথ্যার মাপকাঠি হিসাবে সরওয়ারে ক্বায়েনাত সায়্যিদিল মুরসালীন শাফীউল মুজনাবীন, খাতামুন্নবীয়্যিন রহ্মাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-কে গ্রহণ করতে হয়।

সুপ্রিয় ভ্রাতা! এখন আপনাকে ১ খানা হাদীস বলছি, যে হাদীসখানা সর্বসম্মতিক্রমে সহী। হুযূর (সঃ) বলেন, মান আতানী ফাক্কাদ আতাআল্লাহ। ওয়ামান আসানী ফাক্কাদ আসাআল্লাহ্ (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)

অর্থ: যে ব্যক্তি আমার ইতায়াত (আনুগত্য) করে নিশ্চয় সে আল্লাহ্তাআলার ইতায়াত করে, আর-যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করে নিশ্চয় সে আল্লাহ্তাআলার অবাধ্যতা করে। পবিত্র কুরআনের আয়াত ও এই হাদীসটি মিলিয়ে পড়লে কোন অবস্থাতেই রসূলে পাক (সঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয়। এখন শুনুন হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর কাজ সম্বন্ধে ও বর্তমান যুগের উলামাগণের কাজ সম্বন্ধে। হুযূর (সঃ) কাফিরগণকে মুসলমান করতেন। উলামাগণ মুসলমানগণকে কাফির করেন (ফতোয়া দিয়ে)। এই দল বলে সেই দল কাফির ও সেই দল বলে ঐ দল কাফির। হুযূর (সঃ) ধর্ম প্রচারে কোন (বিনিময়ে) অর্থ নিতেন না। উলামাগণ টাকা ছাড়া কোন ওয়াজ করেন না। মাদ্রাসা শিক্ষার অভ্যন্তরে কি চলছে তা আজ Open secret কারও অজানা নয়।

হুযূর (সঃ) বিশ্ব মানবমন্ডলীকে এক ইসলামের পতাকাতলে একত্রিত করিতে প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন।উলামাগণ মুষ্টিমেয় মুসলমানগণকে সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে বহু দলে-উপদলে বিভক্ত করেছেন ও করছেন। হুযূর (সঃ) পীর-মুরীদি ও কবরপূজা হতে মুক্ত বা সাবধান থাকার জন্য জোর জাগিদ করে গিয়েছেন। অথচ উলামাগণ অধিকাংশই এসব কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লিপ্ত আছেন।

হুযূর (সঃ)-এর জীবদ্দশায় ও তাঁর ওফাতের পর এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে এমনকি কোন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মিলাদ পড়ার কোন দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায় না। উলামাগণ মিলাদকে পেশা হিসাবে নিত্য ব্যবহার্য ধর্মীয় অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করছেন। এমনও শুনা যায় যে, সিনেমা হল উদ্বোধনও মিলাদ মহফিল দ্বারা করা হয়।

ভাই সাহেব, আর একটি বিষয় নিয়েও একটু আলোচনা করতে চাই। ইসলাম ধর্মে স্বীকৃত ঈদ মাত্র দু'টি– ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, লিকুল্লি কাউমিন ঈদ হাযা ঈদুনা অর্থাৎ সব সম্প্রদায়েরই আনন্দ উৎসব আছে। আর আমাদের উৎসব হল এই ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। ইসলামে কারও জন্ম-মৃত্যু দিবস পালনের রীতি নেই। নবী করীম (সঃ)-এর সময়ে বা পরে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইহা পালিত হয়নি। ইদানিং ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষ্যে জশনে জুলুস মিছিল নূতনভাবে আবিষ্কার করা হয়েছে। বলা হয় হুযূর (সঃ)-এর জন্ম যে তারিখ হয়েছিল মৃত্যুও ঐ তারিখেই হয়েছিল। তাহ'লে জন্ম যদি ঈদ হয় মৃত্যু কেমন করে ঈদ হতে পারে? তহশীলদার সাহেব! আমার বক্তব্যের সূচনাতেই বলেছি যে, আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র উপায় হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ। এখন যারা আল্লাহ্র রসূলের সুন্নতের বিপরীত

কাজ করে তাদের অনুসরন যারা করে থাকেন প্রকারান্তরে তারাও আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের নির্ধারিত পথের পরিপন্থী কাজ করেন। জনাব, সত্য ও মিথ্যার কষ্টি পাথর হিসাবে আমরা হযরত মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে গ্রহণ করে থাকি। আমরা একমাত্র কলেমা-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ এর উপর পূর্ণ ঈমান রাখি।

হযরত রসূল করীম (সঃ) বর্তমান যুগ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, যখন ইসলামের অবস্থা খুবই নাজুক হবে তখন হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আগমন করবেন। তাই হুযূর (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক যথা সময়ে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আগমন করেছেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হবে সর্বতোভাবে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সাহায্য করা অথবা বলেছেন, তাঁর ডাকে সাড়া দেওয়া। (সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুল মাহদী)। হুযূর (সঃ)-এর নির্দেশে আমরা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে মেনেছি,।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন, "পবিত্র কুরআনেই তোমাদের জীবন রহিয়াছে। যাহারা কুরআনকে সম্মান করিবে তাহারা আকাশেও সম্মান লাভ করিবে। মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম শাস্ত্র নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) ভিন্ন কোন রসূল বা শাফী (যোজক) নাই, অতএব, তোমরা সেই মহাগৌরবসম্পন্ন নবীর সহিত প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না, যেন আকাশে তোমরা মুক্তি-প্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পার (কিশতিয়ে নূহ)। রসূল-প্রেম সম্পর্কে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেনঃ উওহ্ পেশওয়া হামারা, জিসসে হ্যা নূর সারা নাম উছ্কা হ্যা মুহাম্মদ দিল বর মেরা এহী হ্যা

.....

উস নূর পার ফিদা হুঁ উসকা হী ম্যায় হুয়া হু

উওহ্ হ্যাঁ ম্যাঁ চীজ কিয়া হুঁ বাস ফায়সালা এহী হ্যায় অর্থাৎ আদর্শ তো তিনিই, তিনি আমাদের নেতা। তাঁর (সাঃ) থেকেই নূরের ধারা প্রবাহিত। তাঁর পবিত্র নাম মুহাম্মদ (সঃ)। সদা আমার হৃদয় পরিপূর্ণ, সেই নূরেতে আমি বিলীন, তাঁর দ্বারেই মাথা কুটি-

আমিই বা কে? তিনিই সব, সব মীমাংসা তো ইহাই।

তহশীলদার সাহেব আমার কথা স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলেন। আমার হাতে আর সময় ছিলো না তাই আলোচনা ঐ দিনের মত সেখানে শেষ করে চলে আসি।

–হাফেয মোহাম্মদ সেকান্দর আলী

ওয়াকেআতে শীরীঁ

(২৪ পাতার পর)

দোয়ার মধ্যে ব্যথা :

"দোয়ার নিয়ম-নীতির মধ্যে একথা পাওয়া যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কারও অবস্থার সাথে পুরো সম্পর্ক স্থাপিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় আবেগ, দরদ ও ধ্যান সৃষ্টি হতে পারে না। .....এক সুফীর উল্লেখ এসেছে যে, তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। একটি বালক তার সম্মুখে পড়ে গেল এবং তার পা ভেঙ্গে গেলো। সূফীর প্রাণে ব্যথা লাগলো এবং এখানে তিনি দোয়া করলেন খোদার সকাশে আর নিবেদন করলেন যে, হে খোদা! তুমি এ বালকের পা ঠিক করে দাও নচেৎ তুমি এ কসাইর প্রাণে কেন ব্যথার উদ্রেক করলে" *(মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৪৯)*।

ভালবাসার একটি মাধ্যম সম্পর্ক

"কথিত আছে যে, কোন এক ব্যক্তি ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য লাভের লক্ষ্যে দোয়া করানোর জন্যে ওলী আল্লাহ্ শেখ নিযামউদ্দীনের নিকটে গেলেন। তখন তিনি বল্লেন, আমার জন্যে দুধ ও চাল নিয়ে এসো। ঐ লোকের মনে ধারণা হলো যে, এতো এক আশ্চর্য রকমের ওলী! আমি তার নিকট আমার উদ্দেশ্য নিয়ে এলাম আর তিনি কিনা তার এক উদ্দেশ্য উপস্থাপন করে দিলেন। তাই সে চলে গেলো এবং দুধ ও চাল পাক করে নিয়ে আসলো। যখন তিনি খাওয়া শেষ করলেন তখন তিনি তার জন্যে দোয়া করলেন এবং তার সংকট দূর হয়ে গেলো। তখন নিযামউদ্দীন সাহেব তাকে বল্লেন, আমি তোমার নিকট দুধ ও চাল এজন্যে চেয়েছিলাম যে, যখন তুমি দোয়া করার জন্যে আসলে তখন তুমি আমার নিকট একেবারেই অপরিচিত আর আমার প্রাণে তোমার জন্যে কোন সহানুভূতির কারণ সৃষ্টি হয়নি। এজন্যে তোমার সাথে একটি সম্পর্ক সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আমি একথা চিন্তা করলাম" *(মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা)*।

দোয়া গৃহিত হওয়ার একটি পন্থা

"কখনও কখনও দোয়া গৃহিতও হয় না। ঐ সময়ে এভাবেও দোয়া গৃহিত হয়ে যায় যে, অন্য এক বুযর্গ ব্যক্তি দ্বারা দোয়া করান হয় আর তিনি খোদাতাআলার নিকট দোয়া করেন যেন তিনি ঐ পুরুষটির দোয়াসমূহ শ্রবণ করেন....বাবা গোলাম ফরীদ একবার অসুস্থ হলেন এবং দোয়া করলেন; কিন্তু কোন উপকার দৃশ্যমান হলো না। তখন তিনি স্বীয় শিষ্যকে, যিনি খুবই পুণ্যবান পুরুষ ও পবিত্র ছিলেন [সম্ভবতঃ শেখ নিযামউদ্দীন (রহঃ) বা খাজা কুতুবউদ্দীন (রহঃ)] দোয়ার জন্যে বল্লেন। তিনি খুব দোয়া করলেন; কিন্তু কোন প্রভাব দেখা গেল না। ইহা দেখে তিনি এক রাত্রে খুবই দোয়া করলেন এই বলে যে, হে আমার খোদা! এ শিষ্যকে এমন মর্যাদা দান করো যেন তার দোয়া গৃহিত হওয়ার মর্যাদা লাভ করে আর ভোরে বল্লেন, আজ রাত্রে আমি তোমার জন্যে এ দোয়া করেছি। ইহা শুনে শিষ্যের প্রাণে খুবই আবেগ সৃষ্টি হলো এবং তিনি মনে মনে বল্লেন, যখন তিনি আমার জন্যে এমনভাবে দোয়া করেছেন তখন এস প্রথমে তাকে দিয়েই আরম্ভ করা যাক এবং তিনি এত জোরে-শোরে দোয়া করলেন যে, বাবা গোলাম ফরীদ সুস্থ হয়ে উঠলেন" *(মলফুযাত ৯ম খণ্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা)*। (চলবে)

অনুবাদ – **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

দোয়ার আবেদন

আমার আম্মা মিসেস সাহানা বেগমের (যিনি '৮৭ সালে ধর্মীয় চরম মোখলেফাতের সম্মুখীন হয়েও সত্য ধর্ম আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামে অটুট ছিলেন) পিত্ত থলিতে (Gall Bladder) পাথর হওয়ায় এবং হার্টেরও সমস্যা থাকায় গুরুতর অসুস্থ আছেন।

শীঘ্রই অপারেশন করা হবে। উক্ত অপারেশন যেন সার্বিক সফল হয় এজন্যে আঃ মুঃ জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নী ও শুভাকাঙ্খীদের নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

আফজালুর রহমান রিপন (সাংবাদিক), ক্রোড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

নারীর মর্যাদা

মূল: হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

"নারীদের ও বালিকাদের সঙ্গে সম্পর্ক ও আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে লোকেরা ভুল করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে। কুরআন শরীফে লেখা আছে "তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর" কিন্তু ইহার বিপরীত আমল হচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে দু'ধরনের লোক দেখতে পাওয়া যায়। এক দলতো এরূপ যে, এরা নারীদেরকে লাগামহীন করে দিয়েছে। তাদের উপর ধর্মের কোন প্রভাবই নেই এবং তারা খোলাখুলি ইসলামের পরিপন্থী কাজ করে। কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেসও করে না। কেউ কেউ আবার এরূপ যে, ইহারা নারীদেরকে লাগামহীনতো করেনি, কিন্তু ইহার মোকাবেলায় এইরূপ কড়াকড়ি ও বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে যে, এদের মধ্যে আর জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না। তাদের সাথে দাসী-চাকরাণী ও জীব-জন্তুর চেয়েও মন্দ আচরণ করা হয়। এদেরকে এত নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয় যে, বুঝাই যায় না যে, এরাও জীবন্ত সত্তার অধিকারী। মোট কথা, এদের সঙ্গে অত্যন্ত মন্দ আচরণ করা হয়। এমনকি পাঞ্জাবে এই উদাহরণ বহুল প্রচলিত যে, স্ত্রীলোকদিগকে পায়ের জুতোর সাথে এভাবে তুলনা করা হয় যে, এক জোড়া ফেলে দিয়ে অন্য জোড়া পরে নিলাম। ইহা বড় বিপজ্জনক ব্যাপার এবং ইসলামী বিধি-বিধানের পরিপন্থী। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সব বিষয়ে পরিপূর্ণ নমুনা। তাঁর জীবনে দেখ, তিনি কীভাবে স্ত্রীলোকদের সাথে আচার-ব্যবহার করতেন। আমার দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তি কাপুরুষ ও অমানুষ, যে স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবন আলোচনা করলে তোমরা দেখতে পাবে, তিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী হওয়া সত্ত্বেও এরূপ সদাচারী ছিলেন যে, যদি কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকও তাঁকে দাঁড় করাতো তবে তিনি ঐ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ বৃদ্ধা অনুমতি না দিত" *(মলফুযাত, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪)*।

"এ কথা মনে করো না যে, স্ত্রীলোকেরা এইরূপ বস্তু যাদেরকে খুব তুচ্ছ ও হীন সাব্যস্ত করা যায়। না, না! আমাদের পথ-প্রদর্শক পূর্ণতম নবী রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে নিজের স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করে।" স্ত্রীর সাথে যার চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার ভাল নয় সে কীভাবে পুণ্যবান হতে পারে ? সে অন্যদের সাথে পুণ্য ও উত্তম আচরণ তখনই করতে পারে যখন সে নিজের স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করে ও উত্তম ব্যবহার করে, না কী প্রত্যেক ছোটখাট ব্যাপারে তাকে মারধর করে। এরূপ ঘটনা ঘটে থাকে যে, কোন কোন সময় এক ক্রোধান্বিত ব্যক্তি অতি সামান্য ব্যাপারে স্ত্রীর উপর নারাজ হয়ে তাকে প্রহার করে এবং কোন নাজুক জায়গায় আঘাত লেগে স্ত্রী মরে যায়। এইজন্য এদের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্তাআলা এ কথা বলেন, "নিজেদের স্ত্রীদের সাথে নেক আচরণের সাথে জীবন যাপন কর"। হাঁ, যদি তারা অযথা কাজ করে তবে অবশ্যই সতর্ক করতে হবে। মানুষের উচিত স্ত্রীলোকদের হৃদয়ে এ কথা গ্রোথিত করে দেয়া যে, তারা এরূপ কোন কাজ কখনো পসন্দ করতে পারে না যা ধর্মের পরিপন্থী। এর সাথে সাথেই তারা এরূপ স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারীও হবে না যে, তাদের কোন ভুলই ক্ষমা করবে না।

স্বামী-স্ত্রীর জন্য আল্লাহ্তাআলার বিকাশস্থল হয়ে থাকে। হাদীস শরীফে এসেছে যে, আল্লাহ্তাআলা যদি নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করার আদেশ দিতেন তবে স্ত্রীলোকদেরকে তাদের স্বামীদেরকে সেজদা করার আদেশ দিতেন। অতএব পুরুষদের মধ্যে প্রতাপ ও বিনয় উভয় গুণই থাকা উচিত" *(মলফুযাত, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা)*।

"নির্লজ্জতা ব্যতীত স্ত্রীলোকদের বাকী সব বক্রতা ও তিক্ততা সহ্য করা উচিত। পুরুষ হয়ে নারীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ করা আমার দৃষ্টিতে চরম বেহায়াপনা। খোদা আমাদের পুরুষ বানিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এটা আমাদের জন্য পরম পুরস্কার। এর শোকরিয়া এই যে, আমরা স্ত্রীলোকদের সাথে মিষ্টি ও নম্র ব্যবহার করবো" *(মলফুযাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১)*।

"আমার এই অবস্থা যে, একবার আমি আমার স্ত্রীর সাথে উঁচু আওয়াজে কথা বলেছিলাম। আমি অনুভব করছিলাম যে, ঐ উঁচু আওয়াজের সাথে আমার বিরক্তিবোধ ছিল। এতদ্সত্ত্বেও আমার মুখ থেকে কোন কষ্টদায়ক কটু কথা বের হয়নি। ইহার পর আমি অনেক সময় ধরে ইস্তেগফার করতে থাকি এবং বড় বিনয়ের সাথে ও কাতরভাবে নফল নামায পড়ি। স্ত্রীর প্রতি কঠোর আচরণ আল্লাহ্র কোন গোপন অবাধ্যতার ফল ভেবে কিছু সদকাও দিলাম" (মলফুযাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২)।

"এই আচরণ ঠিক নয়। মুসলমানদের নেতা আবদুল করীমকে এর থেকে বিরত করা উচিত।" .....এই ইলহামে পুরা জামাতের জন্য শিক্ষা আছে যে, নিজেদের স্ত্রীগণের সাথে বন্ধুসুলভ ও বিনম্র আচরণ করা উচিত। তারা তাদের দাসী-চাকরাণী নয়। প্রকৃতপক্ষে বিয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে এক পারস্পরিক চুক্তি। অতএব চেষ্টা কর যেন নিজেদের চুক্তিতে প্রতারক সাব্যস্ত না হও। আল্লাহ্তাআলা কুরআন শরীফে বলেন, "নিজেদের স্ত্রীদের সাথে নেক আচরণের সহিত জীবন যাপন কর।" হাদীসে আছে, "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে নিজের স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করে।" অতএব আধ্যাত্মিক ও দৈহিকভাবে নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ কর। তাদের জন্য দোয়া করতে থাক এবং তালাক পরিহার কর। কেননা, খোদার দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত মন্দ, যে তালাক দেয়ার ব্যাপারে ত্বরা করে। যাকে খোদা জোড়া করেছেন তাকে একটি ময়লা বাসনের ন্যায় ত্বরা করে ভেঙ্গে ফেলো না" (তোহ্ফায়ে গোলড়াবীয়ার পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা ৩৭- টীকা)।

"প্রবন্ধ পাঠকারী কুরআন শরীফের বিরুদ্ধে একটি এই আপত্তি উত্থাপন করে যে, স্বামীর ইচ্ছায় তালাক হয়। সম্ভবত: এর দ্বারা তার বলার উদ্দেশ্য এই মনে হয় যে, বিবেকের দিক থেকে পুরুষ ও নারী পদ-মর্যাদায় সমান। তাহলে এমতাবস্থায় তালাকের অধিকার কেবল পুরুষের হাতে রাখা নি:সন্দেহে আপত্তিযোগ্য হবে। অতএব এই আপত্তির জবাব ইহাই যে, পুরুষ ও নারী পদ-মর্যাদায় সমান নয়। পৃথিবীর আদি অভিজ্ঞতা ইহাই প্রমাণ করেছে যে, পুরুষ তার দৈহিক ও জ্ঞানের শক্তিতে নারীর চেয়ে অগ্রগামী এবং কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম হয়। অতএব যখন পুরুষের পদ-মর্যাদা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শক্তির দিক থেকে নারীর চেয়ে অধিক তখন ইহাই ন্যায় বিচারের কথা যে, পুরুষ ও নারীর পৃথক হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষমতার রাশ পুরুষের হাতেই রাখতে হবে। কিন্তু অবাক লাগে এই আপত্তি একজন আর্য কেন উত্থাপন করলো? কেননা, আর্যদের নীতির আলোকে নারীর তুলনায় পুরুষের পদ-মর্যাদা এত বেশী যে, ছেলের জন্ম না হলে পরিত্রাণই

পাওয়া যায় না.....। এ কথা সকলে জানে, যদি একজন আর্যের চল্লিশটি মেয়েও হয় ধরে নাও ১০০ (একশত) মেয়ে হয় তবুও সে তার পরিত্রাণের জন্য পুত্র সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং তার ধর্মের প্রেক্ষিতে একশত মেয়েও এক ছেলের সমান হতে পারে না.....।

এতদ্ব্যতীত মণুশাস্ত্র পড়ে দেখ। এতেও সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে, যদি নারী পুরুষের দুশমন হয়ে যায় বা তাকে বিষ দিতে চায়, বা এরূপ আরো কোন কারণ ঘটে, তবে পুরুষের তালাক দেয়ার অধিকার থাকে। কার্যত: সকল সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের এটাই রীতি যে, যদি তারা স্ত্রীলোককে মন্দস্বভাব ও মন্দ চাল-চলন বিশিষ্ট দেখে তবে তাকে তালাক দিয়ে দেয়। সমগ্র বিশ্বে মানব প্রকৃতি এটাই পসন্দ করেছে যে, প্রয়োজনের সময় পুরুষরা স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দেয়। স্ত্রীলোকদের উপর পুরুষের আরো একটি অতিরিক্ত দায়িত্ব আছে। তা হলো পুরুষ স্ত্রীলোকের সারাজীবনের সকল প্রকারের সাচ্ছন্দ্যের ভার বহনকারী হয়ে যায়, যেমন আল্লাহতাআলা কুরআন শরীফে বলেন, "এই বিষয়টি পুরুষের দায়িত্ব যে, তারা স্ত্রীলোকদের খাওয়া পরার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগান দেবে।" এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, পুরুষকে স্ত্রীলোকদের মুরব্বী, উপকারী ও সুখ-সুবিধা বিধানের দায়-দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তারা স্ত্রীলোকদের জন্য প্রভুত্ত তত্ত্বাবধায়কস্বরূপ। এইভাবে স্ত্রীলোকদের তুলনায় পুরষদেরকে প্রকৃতিগতভাবে প্রচণ্ড শক্তি দেয়া হয়েছে। এ কারণেই যখন থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকে পুরুষরা স্ত্রীলোকদের শাসন করে আসছে। পুরুষের প্রকৃতিতে যে পরিমাণ শক্তি দান করা হয়েছে সে পরিমাণ শক্তি স্ত্রীলোকদের দেয়া হয়নি। কুরআন শরীফে এই আদেশ আছে যে, যদি পুরুষ নিজের স্ত্রীকে সদ্ব্যবহার ও দয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে এক পাহাড় পরিমাণ সোনাও দেয় তবুও তালাকের সময় তা ফেরৎ নেবে না। এতে প্রতীয়মান হয়, ইসলামে স্ত্রীলোকদেরকে কতখানি সম্মান দেয়া হয়েছে। একদিক থেকেতো পুরুষদেরকে স্ত্রীলোকদের দাস সাব্যস্ত করা হয়েছে। যাহোক পুরুষদের জন্য কুরআন শরীফে এই আদেশ আছে অর্থাৎ তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে এরূপ সদাচরণ কর যাতে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে দয়া ও সদাচরণ করে থাক।

এতদ্ব্যতীত ইসলামী শরীয়ত কেবল পুরুষদের হাতেই ক্ষমতা রাখে নি যে, যখন কোন মন্দকাজ বা গরমিল দেখবে তখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও। বরং স্ত্রীদেরকেও এ অধিকার দেয়া হয়েছে যে, তারা যুগ-হাকিমের মাধ্যমে তালাক নিয়ে নিবে। যখন স্ত্রীলোকেরা হাকিমের মাধ্যমে তালাক নেয় তখন ইসলামী পরিভাষায় এর নাম হয় 'খোলা'। যখন স্ত্রীলোক দেখবে পুরুষ যালেম, অথবা তাকে সে অন্যায়ভাবে মারে, বা অন্যভাবে অসহনীয় খারাপ ব্যবহার করে, বা অন্য কোন কারণে অমিল হয়, বা ঐ পুরুষ প্রকৃতপক্ষে পুরুষত্বহীন হয়, বা সে ধর্ম ত্যাগ করে, বা এরূপ অন্য কোন কারণ ঘটে যায় যার দরুন স্ত্রীলোকের পক্ষে তার ঘরে বসবাস করা অসহনীয় হয়, এ সকল অবস্থায় স্ত্রীলোক বা তার কোন অভিভাবকের উচিত যুগ-হাকিমের নিকট এ অভিযোগ করে। যুগ-হাকিম যদি স্ত্রীলোকের অভিযোগ সত্যই সঠিক মনে করেন তবে তাঁর উচিত হবে এই স্ত্রীলোককে এই পুরুষের নিকট থেকে নিজ আদেশে পৃথক করে দেয়া ও বিবাহ ভেঙ্গে দেয়া। কিন্তু এমতাবস্থায় এই পুরুষকেও আদালতে ডাকা জরুরী হবে, কেন এই স্ত্রীলোককে তার নিকট থেকে পৃথক করা হবে।

এখন দেখ, ইহা কতখানি ইনসাফের কথা। একদিকে যেমন ইসলাম ইহা পসন্দ করেনি যে, কোন স্ত্রীলোক অভিভাবক ছাড়া, যে তার পিতা বা ভাই বা অন্য কোন আত্মীয় হবে, নিজে নিজেই নিজের বিয়ে কারো সাথে করবে, তেমনি অন্যদিকে ইহাও পসন্দ করেনি যে, স্ত্রীলোক নিজে নিজেই পুরুষের ন্যায় নিজের স্বামীর নিকট থেকে পৃথক হয়ে যাবে। বরং পৃথক হওয়ার সময় বিয়ের চেয়েও অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। যুগ-হাকিমের মাধ্যমেই ফরয সাব্যস্ত করেছে যাতে স্ত্রীলোক তার বুদ্ধি ভ্রষ্টতার দরুন নিজের কোন ক্ষতি সাধন না করতে পারে" *(চশমায়ে মারেফাত, পৃষ্ঠা – ২৭৩-২৭৬)*।

"অতঃপর প্রবন্ধ পাঠকারী বর্ণনা করেছে, কুরআনে লেখা আছে যে, স্ত্রীলোকেরা জমির ন্যায় কেবল যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার মাধ্যম। এখন দেখা উচিত, এই অপবিত্র স্বভাবের হিন্দু মিথ্যা বানোয়াটে কতখানি এগিয়ে যায় এবং কীভাবে নিজের পক্ষ হতে শব্দ বানিয়ে কুরআন শরীফের প্রতি আরোপ করে। এইরূপ মিথ্যা বানোয়াটকারীর মোকাবেলায় আমরা–"মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হউক" বলা ছাড়া আর কি বলতে পারি? কুরআন শরীফে কেবল এই আয়াত আছে তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য একটি জমি। অতএব তোমরা তোমাদের জমির দিকে যেভাবে চাও আস। কেবল জমি হওয়ার প্রতি লক্ষ্য রেখো। অর্থাৎ এভাবে স্ত্রী সহবাস করো না যা সন্তানলাভে বাধা হয়.....। হ্যাঁ, যদি স্ত্রী অসুস্থ হয় এবং নিশ্চিত হও যে, গর্ভধারণ করলে তার মৃত্যুর আশংকা দেখা দিবে, এরূপ সৎ উদ্দেশ্যেই যদি অন্য কোন বাধা থাকে তবে এ সকল অবস্থা ব্যতিক্রমধর্মী। অন্যথা সন্তান হওয়ায় বাধা দান শরীয়ত অনুযায়ী কখনো বৈধ নয়।

মোট কথা, খোদাতাআলা যখন স্ত্রীলোকের নাম জমি রেখেছেন তখন প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে এ জন্যই তার নাম জমি রাখা হয়েছে যে, তাকে সন্তান জন্ম হওয়ার স্থান সাব্যস্ত করা হয়েছে। বিয়ের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে ইহাও একটি উদ্দেশ্য যে, এ বিয়ের মাধ্যমে খোদার বান্দার জন্ম হবে, যে তাঁকে স্মরণ করবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌তাআলা ইহাও সাব্যস্ত করেছেন যে, পুরুষ তার স্ত্রীর মাধ্যমে এবং স্ত্রী তার স্বামীর মাধ্যমে কুদৃষ্টি ও কুকর্ম হতে রক্ষা পাবে। তৃতীয় উদ্দেশ্য ইহাও সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টির মাধ্যমে একাকীত্বের কষ্ট হতে রক্ষা পাবে। এ সকল আয়াত কুরআন করীমে মজুদ আছে। আমি গ্রন্থের কলেবর আর কত বড় করবো *(চশমায়ে মা'রেফত, পৃষ্ঠা ২৭৯-২৮০)*?

"বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে এই আপত্তি উত্থাপন করা হয়, বহু বিয়েতে এই যুলুম আছে যে, এতে সমতা থাকে না। সমতা এরই মধ্যে আছে যে, একজন পুরুষের একজন স্ত্রী থাকবে। কিন্তু আমার অবাক লাগে এরা অন্যদের ব্যাপারে কেন খামাখা হস্তক্ষেপ করে। এই ইস্যুটি ইসলামে সুপরিচিত যে, ৪টি (চারটি) পর্যন্ত বিয়ে করা বৈধ; কিন্তু এ ব্যাপারে কারো উপর জবরদস্তি নেই। এই ইস্যুটি প্রত্যেক নর-নারী উত্তমরূপে অবগত আছে। এমতাবস্থায় এ সকল স্ত্রীলোকের এই অধিকার আছে, যখন তারা কোন মুসলমানকে বিয়ে করতে চায় তখন তারা প্রথমেই এ শর্ত করিয়ে নিক যে, তাদের স্বামীরা কোন অবস্থাতে দ্বিতীয় বিয়ে করবে না। যদি বিয়ের পূর্বে এইরূপ শর্ত লেখা হয় তবে নিঃসন্দেহে এরূপ স্ত্রীদের স্বামীরা দ্বিতীয় বিয়ে করে তবে তারা অঙ্গীকার ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হবে। কিন্তু যদি কোন স্ত্রীলোক এরূপ শর্ত লেখায় এবং শরীয়তের নির্দেশ মেনে

নেয় তবে এমতাবস্থায় অন্যের হস্তক্ষেপ অসঙ্গত হবে। এ স্থলে এ দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য হবে যে, "মিয়া বিবি রাজী তো কেয়া করেগা কাযী" অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী রাজী থাকলে কাযী কি করবে? প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, খোদা একাধিক বিয়েকে ফরয-ওয়াযিব করেন নি। খোদার আদেশের আলোকে ইহা কেবল বৈধ। অতএব যদি কোন পুরুষ তার কোন প্রয়োজনের দরুন এই বৈধ আদেশের সুযোগ গ্রহণ করতে চায় যা খোদার জারীকৃত কানুনের অধীনে রয়েছে, এবং তার প্রথম স্ত্রী এতে রাজী না হয় তবে ঐ স্ত্রীর জন্য তালাক নেয়ার পথ খোলা আছে। এভাবে সে এ দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে। দ্বিতীয় স্ত্রী লোক, যার সাথে বিয়ে করার ইচ্ছা, সে যদি এ বিয়েতে রাজী না হয় তবে তার জন্যেও এই সহজ পথ খোলা আছে যে, সে এরূপ আবেদনকারীকে নেতিবাচক উত্তর দিয়ে দিবে। কারো উপর তো জবরদস্তি নেই। কিন্তু যদি ঐ দুজন স্ত্রী লোকই এ বিয়েতে রাজী হয়ে যায় তবে এমতাবস্থায় আর্যের খামাখা হস্তক্ষেপ করার কি অধিকার আছে? এই পুরুষ কি ঐ স্ত্রীলোকদেরকে বিয়ে করবে, নাকি এই আর্যকে? যে অবস্থায় খোদা কোন উপলক্ষ্যে মানুষের প্রয়োজনে একাধিক বিয়ে বৈধ রেখেছিলেন এবং একজন স্ত্রীলোক তার স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েতে সম্মতি প্রকাশ করে এবং দ্বিতীয় স্ত্রীলোকও এই বিয়েতে সন্তুষ্ট, সে অবস্থায় তাদের পারস্পরিক ফয়সালাকে রদ করার অধিকার কারো নেই। এই বিতর্ক উত্থাপন করা যে, একাধিক বিয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ন হয় ও ক্ষমতার পরিপন্থী হয়, ইহা এই সকল লোকের কথা যাদের বিবেক বিদ্বেষের দরুন মারা গেছে। বলা বাহুল্য, এই ইস্যুটি মানবাধিকার সম্পর্কিত। যে ব্যক্তি দু'টি বিয়ে করে তাতে খোদাতাআলার ক্ষতি নেই। যদি ক্ষতি হয় তবে তা হয় প্রথম স্ত্রীর বা দ্বিতীয় স্ত্রীর। অতএব যদি প্রথম স্ত্রী এই বিয়েকে নিজের অধিকার হরণ মনে করে তবে সে তালাক নিয়ে এই বিবাদ থেকে রেহাই পেতে পারে। যদি স্বামী তালাক না দেয় তবে যুগ-হাকিমের মাধ্যমে সে খোলা করিয়ে নিতে পারে। যদি দ্বিতীয় স্ত্রী তার কিছু ক্ষতি মনে করে তবে সে তার লাভ-লোকসান নিজেই বুঝে। অতএব এই আপত্তি করা যে, এইভাবে ক্ষমতা হস্তচ্যুত হয়, ইহা খামাখা হস্তক্ষেপ। এতদ্‌সত্ত্বেও খোদাতাআলা পুরুষদেরকে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদি তাদের কয়েকজন স্ত্রী থাকে তবে তাদের মধ্যে সমতা রাখতে হবে। নতুবা এক স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এই কথা বলা যে, একাধিক বিয়ে কামাসক্তির দরুন করা হয়, ইহাও সরাসরি অজ্ঞতা ও বিদ্বেষপূর্ণ ধারণা। আমি তো আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, যে সকল লোকের মধ্যে কামাসক্তির আধিক্য থাকে, যদি তারা একাধিক বিয়ের মোবারক প্রথার অনুগামী হয়ে যায় তবে তারা অন্যায় ও পাপ, ব্যভিচার ও কুকর্ম হতে নিবৃত্ত হয়ে যায়। এই ব্যবস্থা তাদেরকে মুত্তাকী ও পরহেযগার বানিয়ে দেয়। অন্যথা কামাসক্তির প্রবল ও তীব্র প্লাবন তাদেরকে পতিতাদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। অবশেষে তারা সিফিলিস ও গনোরিয়া খরিদ করে এবং কোন বিপজ্জনক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে ঐ সকল পাপ ও অন্যায় কাজ গোপনে ও প্রকাশ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এর দৃষ্টান্তে ঐ সকল লোকের মধ্যে কখনো দেখা যায় না যাদের দুই তিন জন পসন্দসই স্ত্রী থাকে। এ সকল লোক কিছুদিন পর্যন্ত নিজেদেরকে নিবৃত্ত রাখে। অবশেষে একবার তাদের অবৈধ কামাসক্তি এভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ে যেভাবে একটি নদীর বাঁধ ভেঙে ঐ নদী দিনে বা রাতে চতুর্দিকের সকল গ্রামকে ধ্বংস করে দেয়। সত্য কথা তো ইহাই যে, সকল কাজ নিয়্যতের উপর নির্ভর করে। যে সকল লোক নিজেদের মধ্যে ইহা অনুভব করে যে, দ্বিতীয় বিয়ে করলে তাকওয়ার উপকরণ পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তারা পাপ ও অন্যায় থেকে বেঁচে যাবে, বা তারা এর মাধ্যমে নিজেদের নেক সন্তান পশ্চাতে রেখে যাবে। তবে তাদের জন্য ইহা ফরয (অবশ্য কর্তব্য) যে, তারা এই বরকতময় কাজে অংশ নিবে। খোদার দরবারে কুকর্ম ও কুদৃষ্টি এরূপ অপবিত্র পাপ, যদ্বারা নেকীসমূহ রদ হয়ে যায়। অবশেষ তাদের উপর এ পৃথিবীতেই দৈহিক আযাব অবতীর্ণ হয়ে যায়। অতএব যদি কেউ তাকওয়ার সুদৃঢ় দূর্গে প্রবেশ করার নিয়্যতে একাধিক বিয়ে করে, তাদের জন্য ইহা কেবল বৈধই নয়, বরং এই কাজ তাদের জন্য পুণ্যের কারণ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি নিজেকে কুকর্ম হতে নিবৃত্ত রাখার জন্য একাধিক বিয়ের অনুগামী হয় যেন নিজেকে ফিরিশ্‌তাদের ন্যায় বানাতে চায়। আমি ভালভাবে জানি এই অন্ধ পৃথিবী কেবল মিথ্যা তর্কশাস্ত্রে ও মিথ্যা দম্ভে আক্রান্ত। ঐ সকল লোক যারা তাকওয়ার অন্বেষণে লেগে থাকে না কীভাবে তাকওয়া অর্জন করা যায় এবং তাকওয়া অর্জনের জন্য কোন চেষ্টা করে না এবং দোয়া করে না, তাদের অবস্থা ঐ ফোঁড়ার ন্যায় যা উপর থেকে খুব চমকায়, কিন্তু এর ভিতরে পুঁজ ছাড়া আর কিছু নেই। খোদার দিকে যারা ঝুঁকে পড়ে তারা কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করে না। তারা তাকওয়ার পথসমূহকে এভাবে খুঁজে বেড়ায় যেভাবে এক ভিক্ষুক খাদ্য তালাশ করে বেড়ায়। যে সকল লোক খোদার পথে বিপদের আগুনে পড়ে, যাদের হৃদয় সর্বদা চিন্তাযুক্ত থাকে এবং খোদার পথে বড় কিন্তু কঠিন লক্ষ্যসমূহ তাদের আত্মাকে বিলীন করে ও কোমর ভাংতে থাকে, তাদের জন্য খোদা নিজেই পরামর্শ দেন তারা যেন দিনে বা রাতে কয়েক মিনিট নিজেদের প্রিয় স্ত্রীদের সাথে কাটায় এবং এভাবে নিজেদের ক্লান্ত শ্রান্ত দেহকে আরাম দেয়। অতঃপর পূর্ণ উদ্যমে নিজেদের ধর্মীয় কাজে মগ্ন হয়ে যাবে। এ সকল কথা কেউ বুঝে না, কেবল তারাই বুঝে যারা এ পথের সাথে পরিচিত (চশমায়ে মা'রেফত, পৃষ্ঠা ২৩৬-২৩৯)।

"ভালবাসা বাদ দিয়ে আমলের দিক থেকে সকল স্ত্রীকে আচার-ব্যবহার এমনকি স্ত্রী-সহবাসেও সমতা বজায় রাখতে হবে। এই সকল অধিকার এই ধরনের যে, যদি মানুষ এগুলো সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হয় তবে বিয়ের পরিবর্তে তারা চিরকুমার থাকা পসন্দ করবে। খোদাতাআলার কড়া নির্দেশের অধীন থেকে যে-ব্যক্তি জীবন অতিবাহিত করে সে-ই এ সকল পালন করতে পারে। এরূপ স্বাদ-আহ্লাদের ক্ষেত্রে খোদাতাআলার চাবুক সর্বদা মাথার উপর থাকে। এর চেয়ে তিক্ত জীবন যাপন করে নেয়া হাজার গুণে উত্তম। একাধিক বিয়ের ব্যাপারে যদি আমি শিক্ষা দেই তবে তা কেবল এ জন্য যে, এতে মানুষ পাপের হাত থেকে বেঁচে থাকে। শরীয়ত একে প্রতিকার রূপেই রেখেছে যে, যদি মানুষ তার নফ্‌সের প্রবণতা ও কামাসক্তির প্রতি দেখে এবং তার দৃষ্টি বারবার মন্দ হতে থাকে তবে ব্যভিচার হতে বাঁচার জন্য সে দ্বিতীয় বিয়ে করবে। কিন্তু সে প্রথম স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ন করবে না। তওরাত থেকেও ইহা প্রমাণিত হয় যে, প্রথম স্ত্রীর মনোরঞ্জন বেশী করতে হবে। কেননা, যৌবনের অনেকাংশে সে তার সাথে অতিবাহিত করে থাকবে এবং স্বামীর সাথে তার একটি গভীর সম্পর্ক হয়। প্রথম স্ত্রীর প্রতি খেয়াল রাখা ও তার মনোরঞ্জন এতখানি করা উচিত যে, যদি পুরুষ দ্বিতীয় বিয়ের কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, কিন্তু সে দেখে দ্বিতীয় বিয়ে করলে

তার প্রথম স্ত্রী খুব ব্যথা পাবে ও তার খুব মনোকষ্ট হবে সেক্ষেত্রে যদি সে ধৈর্য ধারণ করতে পারে ও কোন পাপে জড়িয়ে না পড়ে এবং না তার দ্বারা শরীয়তসম্মত কোন প্রয়োজনীয়তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তা'হলে এমতাবস্থায় সে যদি প্রথম স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য তার এ সকল প্রয়োজনীয়তা কুরবানী করে দেয় এবং এক স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে তবে কোন ক্ষতি নেই এবং দ্বিতীয় বিয়ে না করাই তার জন্য সমীচীন হবে।

খোদাতাআলার নিকট থেকে আমি যা কিছু জেনেছি, কোন কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না রেখেই তা বর্ণনা করছি। অধিক বিয়ের অনুমতির ব্যাপারে কুরআন শরীফের উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা নিজেদের নফ্সকে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবে। অন্যান্য প্রয়োজন যেমন নেক সন্তান লাভ করবে, আত্মীয়-স্বজনের তত্ত্বাবধান করবে এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করে পুণ্য অর্জন করবে ও নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী এক, দুই, তিন ও চারজন স্ত্রীলোককে বিয়ে করার অধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু যদি এদের মধ্যে ন্যায়-বিচার না করতে পার তবে এটা হবে পাপ এবং ঘৃণার দরুন পুণ্যের পরিবর্তে আযাব হাসেল করবে ও একটি পাপ থেকে অন্যান্য পাপের দিকে এগিয়ে যাবে। মনে কষ্ট দেয়া বড় পাপ। মেয়েদের প্রকৃতি বড় নাজুক হয়ে থাকে। যখন পিতামাতা তাদেরকে নিজেদের কাছ থেকে পৃথক করে এবং অন্যের নিকট সমর্পণ করে তখন মনে কর তাদের হৃদয়ে কত আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে। "তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর" এর আদেশ থেকেই মানুষ এর আন্দাজ করতে পারে.....। খোদাতাআলার আইনকে কখনো তাঁর ইচ্ছার পরিপন্থী প্রয়োগ করা উচিত নয় এবং এর থেকে এরূপ ফায়দা উঠানো উচিত নয়। স্মরণ রেখো এরূপ করা পাপ। খোদাতাআলা বারবার বলেন, কামভাব যেন তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ না করে; বরং তোমাদের লক্ষ্য থাকবে তোমাদের সব কাজে যেন তাকওয়া থাকে (মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৫)।

"ইসলাম যেভাবে নারীর অধিকার সংরক্ষণ করেছে অন্য কোন ধর্ম কখনো তা করেনি। সংক্ষিপ্ত কথায় বলা হয়েছে, "যেভাবে নারীর উপর পুরুষের অধিকার আছে ঠিক সেভাবেই নারীদেরও পুরুষের উপর অধিকার আছে।" কোন কোন লোকের অবস্থা শুনা যায় যে, তারা এ বেচারীদেরকে পথের জুতোর ন্যায় মনে করে এবং এদের নিকট থেকে নিকৃষ্ট ধরনের সেবা গ্রহণ করে। এদেরকে গালি দেওয়া হয়। এদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেয়া হয় এবং পর্দার আদেশ এরূপ অবৈধ পন্থায় পালন করানো হয় যে, এদেরকে জীবিত কবর দিয়ে দেয়া হয়। স্ত্রীর সাথে স্বামীর এরূপ সম্পর্ক হওয়া উচিত যেভাবে দু'জন খাঁটি ও প্রকৃত বন্ধুর মধ্যে সম্পর্ক হয়ে থাকে। মানুষের উচ্চাঙ্গীণ চরিত্র ও খোদাতাআলার সাথেই তাদের সম্পর্ক উত্তম না হয় তবে কীভাবে ইহা সম্ভব যে, খোদাতাআলার সাথে তাদের সন্ধি হবে? রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের মধ্যে উত্তম সে, যে তার স্ত্রীর জন্য উত্তম" *(মলফুযাত, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৭-৪১৮)*।

"আমাদের জামাতের লোকদের জন্য প্রয়োজন যে, তাদের নিজেদের পরহেযগারীর জন্য স্ত্রীলোকদেরকে পরহেযগারী শিখাবে। নতুবা তারা গুনাহ্গার হবে। যেক্ষেত্রে তার স্ত্রী সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারে তোমার মধ্যে অমুক অমুক দোষ আছে, সেক্ষেত্রে স্ত্রী খোদাকে কি ভয় করবে? যখন তাকওয়া থাকে না তখন এরূপ অবস্থায় সন্তানও নাপাক জন্ম হয়। সন্তানের পবিত্র হওয়ার জন্য পবিত্রতার সেলসেলা প্রয়োজন। যদি ইহা না থাকে তবে সন্তান খারাপ হবেই। এ জন্য সকলের তওবা করা প্রয়োজন ও স্ত্রীলোকদেরকে নিজেদের উত্তম নমুনা দেখানো উচিত। **স্ত্রীরা স্বামীদের গুপ্তচর হয়ে থাকে**। তারা নিজেদের কুকর্ম এদের নিকট গোপন রাখতে পারে না। এছাড়া স্ত্রীলোকেরা লুকানো অবস্থায় বুদ্ধিমতী হয়ে থাকে। এ কথা মনে করা উচিত নয় যে, তারা আহাম্মক। তারা ভিতরে ভিতরে তোমাদের সকল প্রভাব গ্রহণ করে। যখন স্বামী সরল পথে থাকবে তখন সে তাকে ভয় করবে এবং খোদাকেও.....। সকল নবী ও ওলীগণের স্ত্রীগণ নেক ছিলেন। কারণ তাদের উপর নেক প্রভাব পড়তো। যখন পুরুষেরা কুকর্মপরায়ণ ও পাপী হয় তখন তাদের স্ত্রীরাও তদ্রূপই হয়। একজন চোরের স্ত্রীর কখন মনে হবে যে, সে তাহাজ্জুদ পড়বে? স্বামী যখন চুরি করতে যায় তখন তার স্ত্রী কি ঘরে বসে তাহাজ্জুদ পড়ে? "পুরুষরা নারীদের উপর তত্ত্বাবধায়কস্বরূপ।" এ জন্য বলা হয়েছে স্ত্রীরা স্বামীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। যে সীমা পর্যন্ত স্বামীর যোগ্যতা ও তাকওয়া বাড়াবে, এর থেকে স্ত্রীরা কিছু অংশ নিশ্চয় গ্রহণ করবে। তদ্রূপেই যদি তারা বদমায়েশ হয় তবে স্ত্রীরা বদমায়েশীতে অংশ নিবে" *(মলফুযাত, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৭-২১৮)*।

"যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন চাও তবে ঘরের স্ত্রীলোকদের সংশোধন করাও একান্ত জরুরী ব্যাপার। স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রতিমা পূজার শিকড় আছে। কেননা, তাদের মন-মানসিকতা অলংকার-আসক্তির প্রতি থাকে। এ কারণেই প্রতিমা পূজার সূচনা তাদের থেকেই হয়েছে। ভীরুতার উপকরণও তাদের মধ্যে বেশী থাকে। কেননা, শক্তি প্রয়োগে তারা তাদের ন্যায় মানুষের সামনে হাত জোড় করতে আরম্ভ করে। এজন্য যে সকল লোক নারী-আসক্ত হয় ধীরে ধীরে তাদের মধ্যেও এ অভ্যাস সঞ্চারিত হতে থাকে। অতএব তাদের সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দেয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। খোদাতাআলা বলেন, "পুরুষরা মহিলাদের উপর তত্ত্বাবধায়কস্বরূপ"। এজন্যই পুরুষকে স্ত্রীলোকদের তুলনায় শক্তি বেশী দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে যে সকল প্রগতিবাদী লোক সাম্যের উপর জোর দিচ্ছে এবং বলে, পুরুষ ও নারীর অধিকার সমান তাদের কাণ্ডজ্ঞান সম্পর্কে অবাক লাগে। তারা পুরুষদের জায়গায় মহিলা সেনাবাহিনী তৈরী করে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেখুক তো। তখন কি ফল সমান হবে নাকি ভিন্ন কিছু? একদিকে সে গর্ভবতী এবং অন্যদিকে যুদ্ধ। সে কি করতে পারে? মোটকথা, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের শক্তি কম। এই জন্য পুরুষদের উচিত মহিলাদেরকে নিজেদের অধীনে রাখা *(মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৪)*।

"যদিও আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণের চেয়ে বড় কেউ নেই, কিন্তু তদ্সত্ত্বেও তাঁর স্ত্রীগণ সকল কাজ করতেন। ঝাড়ুও দিতেন এবং এর সাথে ইবাদতও করতেন। বস্তুতঃ এক স্ত্রী নিজের হেফাযতের জন্য একটি দড়ি টাঙ্গিয়ে রাখতেন যাতে ইবাদতের সময় তন্দ্রা না আসে। স্বামীদের হক আদায় করা স্ত্রীলোকদের জন্য ইবাদতের একটি অংশ এবং ইবাদতের অন্য অংশ খোদার শোকর আদায় করা *(মলফুযাত, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩)*।

অনুবাদ: নাজির আহমদ ভূঁইয়া

দাঈ ইলাল্লাহ্ ট্রেনিং কোর্স

আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযলে গত ১৮ই সেপ্টেম্বর '৯৮ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ৩ সপ্তাহ ব্যাপী মোয়াল্লেম রিফ্রেসার্স কোর্স ও দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্ ট্রেনিং কোর্স আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রে আরম্ভ হয়েছে। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব এর উদ্বোধন করেন। বিস্তারিত রিপোর্ট ইনশাল্লাহ্ আগামী সংখ্যায় আসবে।

তাহরীকে জাদীদের মোতালেবাত (দাবীসমূহ)

তাহরীকে জাদীদের পরিকল্পনা ১৯টি মোতালেবা (দাবী) সম্বলিত যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হযরত আকদস খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর পবিত্র ভাষার আলোকে নিম্নে বর্ণিত হলো। পরবর্তীতে এ মোতালেবা ২৭টি পর্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, ১৯৩৪ সনে এ ঐতিহাসিক ঘোষণাটি করা হয়।

১ম মোতালেবা :

আজ থেকে তিন বছরের জন্যে প্রত্যেক আহমদী যারা আমার সাথে এ যুদ্ধে শামেল হতে চায় তাদের ইহা অঙ্গীকার করতে হবে যে, তারা আজ থেকে কেবল এক প্রকারের তরকারী খাবে। যদি মেহমান আসে তবে তার সম্মানার্থে একাধিক নূতন তরকারীর আয়োজন করা যেতে পারে। এছাড়া পোষাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র, অলংকারাদি প্রভৃতির ব্যাপারে অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতে হবে। বাঙ্গালীদের জন্যে এক তরকারীর সাথে ডাল ব্যবহারের অনুমতিও তিনি দিলেন।

২য় মোতালেবা :

জামাতের মধ্য থেকে এই ধরনের লোক এগিয়ে আসুক যারা আগামী ৩ বছর পর্যন্ত নিজস্ব আয়ের কমপক্ষে পাঁচ ভাগ থেকে অধিক তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত সেলসেলার কাজের জন্যে চাঁদা দিতে থাকবে। এক কমিটি এ কাজ তদারকী করবে।

৩য় মোতালেবা :

বিরুদ্ধবাদীদের কলুষতাপূর্ণ পুস্তকাদির জবাব তৈরী করা এবং প্রচার করা। এ কাজের জন্যেও জামাতের লোকদের নিকট থেকে ১৫,০০০/- টাকার একটি ফাণ্ড জমা করা হোক। এ কাজও একটি কমিটির নিকট সোপর্দ করতে হবে।

৪র্থ মোতালেবা :

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়া দরকার এবং ইসলাম ও আহমদীয়তের তবলীগ করা দরকার।

৫ম মোতালেবা :

তবলীগে ইসলামের একটি স্কীমের জন্যে জামাতের বন্ধুরা কমপক্ষে ৫/- টাকা করে ১২০০/- টাকার একটি ফাণ্ড তৈরী করুক। বর্তমানে এ চাঁদার নিম্নতম হার ২৪/টাকা। পরিবারের প্রত্যেককে এতে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৬ষ্ঠ মোতালেবা :

আমি চাই যে, যারা জীবন উৎসর্গ করতে আকাঙ্ক্ষী তাদের মধ্য থেকে পাঁচজনকে বেছে নেয়া হোক। তারা সাইকেল যোগে সারা পাঞ্জাব ভ্রমণ করবে আর তবলীগের ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত রিপোর্ট দিবে।

৭ম মোতালেবা :

তবলীগের কাজকে বিস্তার দেয়ার জন্যে সরকারী চাকুরীজীবীগণ তিনমাসের ছুটি নিয়ে তবলীগের জন্যে তাদেরকে পেশ করুন। এসব ব্যক্তিবর্গের জন্যে জরুরী হবে যে, তারা মালকানা অভিযানের ন্যায় নিজেদের খরচ নিজেরা বহন করবেন।

৮ম মোতালেবা :

তিন বছরের জন্যে যেসব যুবক ইসলামের সেবায় জীবন ওয়াকফ (উৎসর্গ) করতে পারেন তারা যেন তা করেন।

৯ম মোতালেবা :

যারা ৩ মাসের ছুটির সময় না দিতে পারেন তারা তাদের মৌসুমী ছুটির সময় ওয়াক্‌ফ করে দেন। তাদের আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে তাদেরকে তবলীগ করতে বলা হবে।

১০ম মোতালেবা :

বিভিন্ন পেশাজীবীর লোক যেমন ডাক্তার, উকিল বা অন্যান্য সম্মানিত পেশার লোক যাদেরকে লোকেরা সম্মানিত দৃষ্টিতে দেখে, তারা নিজেদেরকে পেশ করুন যেন তাদেরকে বিভিন্ন স্থানে মোবাল্লেগদের পরিবর্তে পাঠান যায় এবং তাদের দিয়ে জলসাসমূহে বক্তৃতা দেওয়ানো যায়।

১১শ মোতালেবা :

জরুরী কাজের লক্ষ্যে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া রিজার্ভ ফাণ্ডে ৫০ লক্ষ টাকা জমা করার জন্যে সকলকে উদ্যোগ নিতে হবে।

১২শ মোতালেবা :

পেনশনপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ সেলসেলার কাজের জন্যে যেন নিজেদেরকে পেশ করেন।

১৩শ মোতালেবা :

সন্তান-সন্ততিকে লেখাপড়ার জন্যে কাদিয়ানে প্রেরণ করা হোক।

১৪শ মোতালেবা :

এক কমিটি নিযুক্ত করা হোক। যারা তাদের ছেলেমেয়ের উচ্চশিক্ষা দিতে চান তারা তাদের সন্তানদের জীবন-বৃত্তান্ত ঐ কমিটির নিকট পেশ করুন যাতে কমিটি ঠিক করে দেন যে, ঐ ছেলে কিসে উচ্চ শিক্ষা নিতে পারে। এর কারণ এই যে, প্রত্যেক বিভাগে যেন আমাদের লোকেরা পারদর্শী হয়ে ওঠে বিশেষ কোন বিভাগে যেন আধিক্যের সৃষ্টি না হয়।

১৫শ মোতালেবা :

যেসব বেকার যুবক বাড়ীতে বসে বসে পিতামাতার অন্ন ধ্বংস করে তাদের উচিত তারা যেন দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমায়। যাবার পূর্বে যেন খবর দিয়ে যায় যে, তারা কোন্ দেশে যাচ্ছে।

১৬শ মোতালেবা :

প্রত্যেকের নিজের কাজ নিজে করার অভ্যেস সৃষ্টি করার দরকার। ইহা নিন্দনীয় নয় বরং সম্মানের কাজ। কাদিয়ানের লোকদেরকে বলা হচ্ছে তারা যেন পর্যায়ক্রমে দলে দলে কাদিয়ানের অলি-গলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কর্মসূচী গ্রহণ করে।

১৭শ মোতালেবা :

যারা বেকার রয়েছে এবং দেশের বাইরে যাওয়ার সঙ্গতি নেই তারা যেন বেকার বসে না থেকে ছোট থেকে ছোট কাজ করতে লেগে যায়।

১৮শ মোতালেবা :

সেলসেলা আলীয়া আহমদীয়ার কেন্দ্র কাদিয়ানে বাড়ী তৈরী করুন। কাদিয়ানকে আল্লাহ্‌তাআলা সেলসেলার স্থায়ী কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

১৯শ মোতালেবা :

দুনিয়ার উপকরণ যতই সংগ্রহ করা হোক না কেন তা দুনিয়ারই উপকরণ। আমাদের উন্নতির ভিত্তি এর ওপরে নয়। আমাদের উন্নতির ভিত্তি হলো আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত উপকরণের ওপরে। তাই যারা উপরোক্ত মোতালেবার শর্ত পূরণ করতে অক্ষম তারা যেন সেলসেলার উন্নতির জন্যে বেশী বেশী দোয়ায় লিপ্ত থাকেন।

মোতালেবাতের বৃদ্ধি :

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ১৯৩৭ সনের ডিসেম্বর মাসে ৫টি নতুন মোতালেবা ঘোষণা করেন জামাতের সামনে। মোতালেবাগুলো নিম্নরূপ :

২০শ মোতালেবা :

নিজ নিজ ধন-সম্পদ থেকে মহিলাদেরকে শরীয়ত মোতাবেক অংশ আদায় করুন।

২১শ মোতালেবা :

মহিলাগণের অধিকার এবং আবেগ ও অনুভূতির প্রতি দৃষ্টি রাখুন।

২২শ মোতালেবা :

প্রত্যেক আহমদী পরিপূর্ণ আমানতদার (বিশ্বস্ত) হবে আর কারও আমানত খেয়ানত (অবিশ্বস্ততা) করবে না।

২৩শ মোতালেবা :

খোদার সৃষ্টির সেবা করুন। নিজ হাতে কাজ করুন আর নিজে পরিশ্রম করে নিজের গ্রাম ইত্যাদিকে পরিচ্ছন্ন করুন।

২৪শ মোতালেবা :

প্রত্যেক আহমদীর অন্তরে এই দৃঢ়-বিশ্বাস পোষণ করা উচিত যে, আগামীতে সরকার বাধ্য না করলে আদালতে কোন মোকদ্দমা দায়ের করবে না। বরং নিজস্ব আদালতি বোর্ড ও কাযা বোর্ডে পেশ করবেন আর এর রায়ের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করবেন।

২৫শ মোতালেবা :

সন্তানদেরকে ইসলামের জন্যে উৎসর্গ করুন। মনে রাখা দরকার যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) নিজ সন্তান হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী করে উভয়ে আজও অমর হয়ে রয়েছেন (খুতবা ঈদুল আযহা : ৯-৯-১৯৪১)।

২৬শ মোতালেবা :

সম্পত্তি ও আয় ওয়াক্‌ফ করুন (আল ফযল : ১৩-৩-১৯৪৪)।

২৭শ মোতালেবা :

হিলফুল ফুযূলের ন্যায় সমিতি গঠন করুন (খুতবা জুমুআ : ২২-৭-১৯৪৪)।

সংগ্রহ ও অনুবাদ– মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

কবিতা

বন্যায় কান্না

–ফজলে-ই-ইলাহী

তটিনী তটের গৃহ ভাঙ্গিয়া
বৃক্ষ ডালের চূড়া ডিঙ্গিয়া
অথই জলের স্রোতধারা আজি বহিছে দেশের গায়,
খোদার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ মানুষ কাঁদিছে অসহায়।
ঝঞ্ঝা ঝড় আর বন্যা খরা
নিত্যই কেন করিছে তাড়া
কেন এমন আঘাত হানে মানব বসত ঘরে,
অনেক ধনের গর্ব যাহার, ফকীর ক্ষণিক পরে?
মমতা মাখা সৃষ্টি যাঁর
তিনিই কেন করিছে প্রহার
রোগ শোক আর ভূ-কম্পন, ভয়ঙ্কর সব বালাই,
ঘুমে রেখেই হাজার প্রাণ নিঘুম করে পালায়?
অসীম অপার করুণা যাঁর
কেনই তাঁর এ রুষ্ট আচার
বিবেক দিয়ে তা ভাবনার আজ বড়ই প্রয়োজন,
রহমান খোদার বান্দারা এত বিরাগ ভাজন?
খুলে দেখ ভাই কোরান খানি
রয়েছে তাতে শাশ্বত বাণী
"সৃষ্টির দয়ায় স্রষ্টা পাঠান যুগে যুগে প্রতিনিধি,
কঠিন আযাব গ্রাস করে তখন, তাঁকে না মানে যদি"।
এবারও খোদার বিধান মতে
আসিয়া মাহদী স্বর্গ হতে
"নুহের যুগের প্লাবন ঘটিবে", করিলেন হুশিয়ারী,
সত্য মাহদীকে গ্রহণ করিতে, হয় যদি কভু দেরী।
সাদ, সামুদ, আদ, ফেরাউন জাতি
হয়েছে তাদেরও নির্মম গতি
তাইতো হে ভাই! তোমাকে জানাই, যুগ খলীফার ডাক,
যেচে নাও তাঁকে নতুবা জীবনে আসিবে দুর্বিপাক।

শোকসংবাদ

❑ আমার আম্মা মোসাম্মাৎ সিদ্দীকা খাতুন বিগত ১৬ সেপ্টেম্বর, ৯৮ইং সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে .....রাজেউন)।

আল্লাহ্‌তাআলা যেন তাঁর অফুরন্ত রহমতে আমার আম্মাকে জান্নাতের সুউচ্চ মকাম প্রদান করেন তার জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট বিনীতভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। –মহিউদ্দিন আহমদ, ঘোড়াশাল

❑ আমার পিতা জনাব ডাঃ আব্দুল হাকিম গত ২৫শে সেপ্টেম্বর '৯৮ বিকেল ৪-১০ মিঃ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহে... রাজেউন)।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৮ বছর। তিনি স্ত্রী, ৬ পুত্র ও ৪ কন্যা এবং অনেক নাতি-নাতনী রেখে গেছেন। তাঁর রূহের মাগফেরাত ও দারাযাতের বুলন্দী এবং পরিবারের সকলের সাবরে জামীলের জন্যে জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

এনামুল হাকিম, প্রেসিডেন্ট আজীমপুর হালকা, ঢাকা

ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার
ফোন: ৯৬৬২৭০৩ (9662703)
দোয়া চেয়ে: আবুল হোসেন ভূঁইয়া (কায়েদ)

শান্তি প্রিয় দেশবাসী ও হৃদয়বান মুসলমানদের নিকট নিবেদন

'আমরা ঢাকাবাসী' বলে তথাকথিত একটি রাজনৈতিক দল একটি শান্তিপ্রিয় ধর্মীয় আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের বিরুদ্ধে এই শিরোনাম দিয়ে **"৪নং বকশিবাজার যদি মসজিদ হয় তবে মুসলমান সেখানে নামাজ পড়বে। ইনশাল্লাহ্'** একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে সারা দেশে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ছোট ছোট লেখা দুই পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের মোদ্দা কথা, যা বিভিন্নভাবে পুনরাবৃত্তি করে কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেইগুলো এই যে :

১। আহমদীরা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে খাতামান্নবীয়ীন বলে বিশ্বাস করে না তাই উলামা মাশাইখ তাদিগকে কাফির বলে ফতওয়া দিয়েছেন।

২। আহমদীয়া মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবকে নবী বলে বিশ্বাস করে এবং মুসলমানদের কাফির বলে মনে করে। মুসলমানদের সাথে বিবাহ ও সামাজিক সম্পর্ক রাখা এমনকি মুসলমানদের মসজিদে নামায পড়া, তাদের নিজস্ব কবরস্থানে মুসলমানদের কবর দেয়া জায়েয বলে মনে করে না।

৩। মির্যা সাহেব ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ নিষিদ্ধ করে তাদের পথ সুগম করেছেন, যা ইসলামের সঙ্গে শত্রুতার নামান্তর।

৪। হযরত আবু বকর সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর প্রথম কাজ ছিল মিথ্যা নবীর দাবীদার মুসায়লামা কায্যাবের বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্রযুদ্ধ ঘোষণা করে তাকে নিহত করা।

উপরে উল্লিখিত চারটি বিষয়ের উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করার পূর্বে শিরোনামটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আহমদী জামাতের ব্যবস্থাপনায় ৪ বকশী বাজারে অবস্থিত মসজিদে আহমদীয়া আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। তাই শুধু সকল মুসলমান ভাইদের জন্যই ইহার দরজা উন্মুক্ত নহে পরন্ত খৃষ্টান বুদ্ধ ও হিন্দু ভাইদের জন্য এক স্রষ্টার ইবাদত করার উদ্দেশ্যে ইহার দরজা সব সময় উন্মুক্ত আছে তবে আল্লাহ্‌তাআলার ইরশাদ অনুযায়ী 'ওয়া মান দাখালাহু কানা আমেনান" (৩ঃ৯৮) যে ব্যক্তি ইহাতে প্রবেশ করবে সে যেন শান্ত ও নিরাপদ দেহ ও মন নিয়ে প্রবেশ করে এবং নামায ও ইবাদতের পর শান্তি ও নিরাপদে দুনিয়াবী কাজ কর্মের জন্য বাইরে চলে আসে। এটাই সকল জাতির মধ্যে ইবাদতের নিয়ম। ৪ বকশী বাজারের আহমদীয়া মসজিদে বহু অ-আহমদী ভাই-বোনেরা অহরহ নামায-পড়ছেন।

১। প্রথম বিষয়ে সংক্ষেপে এতটুকুই বলবো যে যদি আমরা আহমদীরা রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামকে খাতামান্নবীয়ীন বলে ঈমান না রাখি তাহলে খোদার কসম আমরা কাফির আর সব চাইতে বড় কাফির। কিন্তু আমরা আহমদীরা সর্বান্তঃকরণে নবী আকরম হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামকে খাতামান্নবীয়ীন বলে বিশ্বাস করি। হযরত ইমাম মাহদী আলায়হেস সালাম বয়াতের শর্তসমূহের মধ্যে জরুরী শর্ত ইহাই রেখেছেন যে, বয়াতকারী জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামকে খাতামান্নবীয়ীন বলে বিশ্বাস করবে। সুতরাং আমরা কুরআন সুন্নাহ, হাদীস এবং আরবী অভিধানে উল্লিখিত সকল অর্থেই নবী করীম সল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া সাল্লামকে খাতামান্নবীয়ীন বলে মানি, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তিনি কামিল কিতাব ও কামিল শরীয়তের দিক দিয়েও শেষ নবী, অর্থাৎ তাঁর পরে আর কোন শরীয়তধারী নবী নাযিল হবে না। তিনি নবীদের মোহর অর্থাৎ তাঁরই মাধ্যমে নবীদের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে, তিনি নবীদের আংটি অর্থাৎ তারই মাধ্যমে নবীগণের মকাম, মর্যাদা, গুণ, জ্ঞান প্রকশিত হয়েছে। হুযূর আকরম (সঃ) আবির্ভূত না হলে কোন নবী প্রমাণিত হতেন না। এই আযীমুশ্‌শান নবীর কত অপূর্ব ও অতুলনীয় রূহানী শক্তি যে, খোদাতাআ বলেছেন-ওয়া মায়্যুতেল্লাহা ওয়ার্‌রসূলা ফাউলায়কা মায়াল্লাযীনা আনয়ামাল্লাহু আলায়হিম মিনান্নাবীয়ী না ওয়াস্‌সিদ্দীকীনা ওয়াশশোহাদায়ি ওয়াস্‌সলেহীন (৪ঃ৭০) অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ ও এই রসূলের আনুগত্য করবে তারা ঐ সকল লোকের অন্তর্গত হবে যাদের উপর আল্লাহ্ পুরস্কার নাযিল করেছেন অর্থাৎ নবীদের, সিদ্দীকদের, শহীদদের এবং সালেহগণের অন্তর্গত হবে। হুযূর (সঃ)-এর এই শান ও মকাম এবং রূহানী শক্তি অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি, কেবল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আনুগত্যের ফলে একাধারে এই চার প্রকারের পুরস্কারপ্রাপ্ত লোক সৃষ্টি হবে যাদের মধ্যে সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি হলেন একজন উম্মতী নবী। তাই নবী করীম (সঃ) বলেছেন, উলামাউ উম্মাতী কা আম্বিয়ায়ে বানী ইসরাঈল অর্থাৎ আমার উম্মতে হাক্কানী আলেম বাণী ইসরাঈলদের নবীদের মত হবে *(বাহ্‌জাতুন নযর ১৪পৃঃ)*।

আর নিঃসন্দেহে হযরত ইমাম মাহদী আলায়হেস সালাম একজন হাক্কানী আলেমের চাইতে অনেক বড় এবং আযীমুশ্‌শান ইমাম হবেন। তাঁকে ঈসা নবী বলা হয়েছে। নবী করীম (সঃ)-এর দীন ইসলামকে জ্বলন্ত ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী দ্বারা ও কুরআনের দলীলাদি দ্বারা বিশ্বে প্রচার করবেন, ঈমান ও অন্তরের মরিচা ধৌত করবেন তিনি। অতএব এইরূপ উম্মতী নবী ও রূহানী শাগরেদ দ্বারা নবী করীম (সঃ)-এরই গৌরব ও আলীশান উস্তাদ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই রহস্যের প্রতিই ইঙ্গিত করে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন "কূলূ ইন্নাহু খাতামুল আম্বিয়া ওয়ালা তাকুলূ লা নাবীয়্যা বা'দাহু (তাকমেলা মাজমাউল বেহার, ৮৫পৃঃ) অর্থাৎ তোমরা এই কথা অবশ্য বলো যে, তিনি খাতামুল আম্বিয়া কিন্তু এই কথা কখনও বলিও না যে, তাঁর পরে কোন নবী আসবেন না। হযরত মুঈনুদ্দীন আজমেরী (রাঃ) বলেছেন, দামবাদাম রূহুল কোদোস আন্দার মুঈনে সে দামদ মান নামে গোয়াম মাগার মান ঈসা সানী শুদম (দেওয়ানে মুঈনুদ্দীন)। অর্থাৎ মুহূর্তে মুহূর্তে মুঈনুদ্দীনের মধ্যে রূহোল কোদোস (জিবরাঈল) ওহী নিয়ে নাযিল হচ্ছে, আমি কথা বলছি না বরং দ্বিতীয় ঈসারূপে কথা বলছি। এইরূপ উচ্চাঙ্গের খোদাপ্রাপ্ত অজস্র বুযর্গ রয়েছেন যাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি, ইমাম শেখ মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী, সায়্যেদ আবদুল কাদের জীলানী, আবদুল ওয়াহ্‌হাব শেরানী, হযরত ইমাম আলী কারী, হযরত ইমাম তাহের, হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলবী, হযরত মাওলানা আবুল কাসিম নানুতবী, প্রতিষ্ঠাতা দেওবন্দ মাদ্রাসা।

"আমরা ঢাকাবাসী" এবং তাদের মতাবলম্বীগণ নিজেরা মুখে তো বলেন, নবী করীম (সঃ) খাতামান্নবীয়ীন কিন্তু তারা আসলে ঈসা নবী (আঃ)-কে খাতামান্নবীয়ীন বলে বিশ্বাস করেন। কারণ তারা খাতামান্নবীয়ীনের অর্থ করেন শেষ নবী, যিনি শেষে আগমন করেন অথচ তারা বিশ্বাস করেন ঈসা নবী শেষে আসবেন, তা হলে খাতামান্নবীয়ীন ঈসা নবী হলেন কিনা? তারা মনে করেন এই উম্মতে

মুহাম্মদীর মধ্যে সকল পাপ ও গোনাহ হতে থাকবে, অবশেষে তাদের সংশোধনের জন্য এই উম্মত থেকে কোন "মুসলিম সংশোধনকারী আসতে পারবে না রবং একজন বনী ইসরাঈলী নবী এসে তাদের সংশোধন করবেন। তাদের ও আমাদের মধ্যে এইখানেই প্রভেদ। তারা বিশ্বাস পোষণ করেন ঈসা নবীউল্লাহ সশরীরে আকাশে জীবিত আছেন আর আমরা বিশ্বাস করি হযরত ঈসা (আঃ) নিজ আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি আর কখনো এই পৃথিবীতে আসবেন না। হযরত ইমাম মাহদী-ই হযরত ঈসার কাজ করলে ঈসা ও মাহদী একই ব্যক্তি হবেন। লালমাহদী ইল্লা ঈসা (ইবনেমাজাঃ বাব শিদ্দাতুয্‌যামান) ঈসাই মাহদী হবেন। মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল ২য় খঃ ৪১ পৃষ্ঠায় এসেছে, ইমাম মাহদী ঈসা ইবনে মরিয়ম হবেন, মীমাংসাকারী সুবিচারক হবেন– ঈসা ইবনে মরিয়ম তোমাদেরই মধ্য হতে হবেন (বুখারী)। মুসলিমেও এইরূপই বলা হয়েছে।

আহমদীরা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব আলায়হেস সালামকে কখনো নবী বলে বিশ্বাস করে না বরং উম্মতী নবী বলে বিশ্বাস করে। শুধু "নবী" বল্লে ইসলামের পূর্ববর্তী স্বতন্ত্র নবী বুঝায় আর উম্মতী নবী বল্লে এমন নবী বুঝায় যিনি নবী করীম (সঃ)-এর পূর্ণ আনুগত্যের ফলে অদৃশ্য বিষয়ের উপর বেশী বেশী সংবাদ পান। আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, "লা ইউযহেরু আলা গায়বেহী আহাদান ইল্লা মানির্তাযা মিররসূল (৭২ঃ২৭-২৮) অর্থাৎ আল্লাহ্‌ কাহারো উপর অদৃশ্য বিষয়সমূহ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন না কেবল রসূল ছাড়া। অতএব প্রত্যেক নবী-রসূলের উপর শরীয়ত নাযিল হওয়া জরুরী নয়। কুরআনের সূরা হোজোরাতের শেষ রুকুতে আল্লাহ্‌তাআলা যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান করে দাবী করেন, তাকে মুসলমানই বলেছেন। মু'মিনের জন্য পূর্ণ আনুগত্য শর্ত। হাদীসেও নবী করীম (সঃ) এক আদম শুমারীতে যে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে তাকে মুসলমান বলেই রেজিষ্টারে লেখার জন্য বলেছেন (মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ)। অতএব, আহমদীরা কোন্ সাহসে কোন মুসলমানকে অমুসলমান বলবে? এটা আমাদের উপর ডাহা মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে। লা' নাতুল্লাহ্‌ আলালকাযেবীন। বিবাহ সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে, আমরা পারতপক্ষে পরস্পরের মধ্যেই বৈবাহিক সম্পর্ক রাখি, কুরআনে যদিও আহলে কিতাবের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ককে আল্লাহ্‌তাআলা বৈধ করেছেন, তবু তিনি ইরশাদ করেছেন যে, মু'মিন পুরুষ ও মহিলা যেন মু'মিনদের মধ্যে শাদী-বিবাহ করে। এখানে রুচি এবং শৃঙ্খলারও প্রশ্ন আছে যা পরে বৈবাহিক জীবনে আনন্দ ও শান্তি বয়ে আনে। এ বিষয়ে এর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নেই।

নবী করীম সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে বল্লেন, রজানা মিনাল জিহাদেল আস্‌গারে ইলাল জিহাদেল আকবারে" অর্থাৎ আমরা সবচাইতে ছোট জিহাদ (তরবাবির জিহাদ) হতে সব চাইতে বড় জিহাদ (আত্মার সংশোধনের জিহাদ)-এর দিকে ফিরে যাচ্ছি। তরবারির জিহাদ কেবল তখন বৈধ হয় যখন শত্রু তরবারি নিয়ে আক্রমণ করে তখন আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণকে প্রতিহত করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা ইরশাদ করেছেন–উযেনালিল্লাযীন ইউকাতালূনা বেআন্নাহুম, যোলেমু (২২ঃ৪০) অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলা ইরশাদ করেছেন: যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদিগকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া হলো, কারণ তাদের উপরে যুলুম করা হচ্ছে; কিন্তু শত্রুরা যদি সন্ধি করতে চায় তখন তোমরাও সন্ধি করবে (৮ঃ৬২)। স্পষ্ট বুঝা গেল যে, তরবারির জিহাদ অবস্থা বিশেষে সাময়িকভাবে অনুমোদিত; যে মুহূর্তে শত্রুপক্ষ লাঠি সোঁটা বা তরবারি ফেলে শান্তিতে কথা বলতে চাইবে তোমরাও অবশ্যই অস্ত্রসস্ত্র ফেলে শান্তিতে কথা বলবে, কারণ ইসলাম শান্তিরই ধর্ম, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করাই ইসলামের কাম্য বিষয়।

সবচাইতে বড় জিহাদ হলো আত্মসংশোধন। তাবুক যুদ্ধ হতে ফিরার পথে বর্ণিত যে রেওয়ায়াতটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ইহার সঙ্গে মুকাশিফাতুল কুলূবে বর্ণিত (২১৩পৃঃ) রেওয়ায়াতটি যোগ করলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবেঃ

মারহাবান বিকুম কদ্দামতুম মিনাল জিহাদেল আসগারে ইলাল জিহাদিল আকবারে–কীলা ইয়া রসূলাল্লাহ, –ওয়ামাল জিহাদুল আকবারো-কালা জিহাদুন নাফসে"

অর্থাৎ নবী করীম (সঃ) সাহাবাদিগকে মোবারকবাদ জানালেন এবং বল্লেন, তোমরা সবচাইতে ছোট জিহাদ থেকে ফিরেছ সবচাইতে বড় জিহাদের দিকে– বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সবচাইতে বড় জিহাদ দ্বারা কী বুঝায়? ইরশাদ করলেন, আত্মশুদ্ধির জিহাদ।

আরেকটি রেওয়ায়াতে বলেছেনঃ

"ইন্না আ'দা আদুওয়েকা নাকসুকাল্লাতি বায়না জা'ম্বায়কা অর্থাৎ "তোমার সবচাইতে বড় শত্রু হলো তোমার পাঁজরে অবস্থানকারী তোমার আত্মা।" বলা বাহুল্য, সবচাইতে বড় শত্রুর সঙ্গে যে জিহাদ হয় ঐটাই সব চাইতে বড় জিহাদ।

যুগ-ইমাম হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেছেন ঃ

নাফ্‌সকো মারো কেহ্‌ ইস্‌ জায়সা কোই দুশমান নাহী

চুপ্‌কে চুপ্‌কে কারতা হায় উওহ্‌ সামানে দিমার

অর্থাৎ আত্মাকে মার এরূপ শত্রু তোমার আর কেউ নেই চুপি চুপি উহা ধ্বংসের দ্রব্য সৃষ্টি করে।

মোল্লা ভাইয়েরা বেশী ইতিহাস জানে না। তারা গতানুগতিকভাবে তাদের অন্ধ উস্তাদ থেকে কতকগুলি আপত্তি শিখেছে ঐগুলিই তাদের আপত্তির সম্বল। তাই "আমরা ঢাকা বাসী"-কে তখনকার ইতিহাসের দিকে নিরপেক্ষ হৃদয় নিয়ে তাকাতে অনুরোধ করছি। হযরত মসীহে মাওউদ আলাহেস সালামের সময় ভারতে এমন শান্তি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া বিরল। এই হিসাবেই হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) ন্যায়পরায়ণ ইংরেজ শাসকবর্গের প্রশংসা করেছেন। ভাল গুণের প্রশংসা যদি কেউ না করে তা হলে বুঝতে হবে যে, তার ভিতরেই সেই গুণ নেই। ইংরেজদের আসার আগে এদেশে হিন্দু ও শিখদের এত অত্যাচার ও অবিচার মুসলমানদের উপর হচ্ছিল যে, তারা স্বাধীনভাবে ধর্মকর্ম করতে পারতো না। কোন কোন স্থান বিশেষ করে পাঞ্জাবে আযান দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। গাভী যবাই করা নিষিদ্ধ ছিল। ঠিক এইরূপ অন্ধকার অবস্থা ইংরেজরা ন্যায়-বিচার করে; ধর্মে ধর্মে হানা-হানি কাটা-কাটি নিষিদ্ধ করে, পূর্ণরূপ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে। মোল্লা ভাইয়েরা জানেন কি, তখনকার মুসলিম চিন্তাবিদরা বলতেন "ইংরেজদের আগমন দেশবাসীর জন্য নেয়ামতে উয্‌মাস্বরূপ। সায়্যেদ আহমদ বেরেলবী সাহেব (রহঃ) বলেছেন :

"ইংরেজ সরকার মুসলমানদের উপর কোন প্রকার যুলুম অত্যাচার করে না; তাদিগকে ধর্মীয় কর্তব্য ও জরুরী ইবাদতবন্দেগী থেকে বাধা প্রদান করে না। আমরা এদের দেশে প্রকাশ্যভাবে ওয়ায করি এবং ধর্মীয় প্রচার ও প্রসার করে থাকি; তারা আমাদের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না, বাধা প্রদান করে না বরং যদি কেউ আমাদের উপর অত্যাচার করে তা হলে তারা তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে"

(সোয়ানে আহমদী, রচনাকারী;মৌলবী মুহাম্মদ জা'ফর থানেশ্বরী ৪৫পৃঃ)
এইরূপে আরো বহু শীর্ষ স্থানীয় বুযর্গানে কেরাম ইংরেজদের অনেক অনেক প্রশংসা করেছেন। সায়্যেদ মুহাম্মদ ইসাঈল শহীদ ইংরেজদের ভূরিভূরি প্রশংসা করেছেন। আপনারা কি জানেন, এই সব বুযর্গ কত আলী মুকাম ও আলী শান বুযর্গ ছিলেন?

মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব আলায়হেস সালাম যদিও ইংরেজদের সুন্দর শাসন প্রণালী, শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং বিশেষভাবে ন্যায়-বিচার কায়েম করার জন্য মজবুত বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত সুব্যবস্থার নৈতিক ও চারিত্রিকভাবে যতটুকু প্রশংসা করা দরকার ছিল ততটুকু প্রশংসা করেছেন। অথচ তিনি অকাট্য দলীল প্রমাণের ধারলো অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে তাদের প্রিয় ধর্মের উপর ভরপুর আক্রমণ হেনেছেন এবং তাদের ১। কল্পিত খোদা ঈসাকে মৃত প্রতিপন্ন করেছেন। ২। ধর্ম ক্ষেত্রে তাদিগকে দজ্জাল বলে আখ্যা দিয়েছেন।

৩। তাদিগকে য়া'জূজ মা'জূজ বলে আখ্যা দিয়েছেন ৪। তাদের ক্রুশকে খন্ডবিখন্ড করে গোটা ধর্মকে উৎপাটিত করে চিরতরে খৃষ্টান পাদ্রীদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। হে তথাকথিত "আমরা ঢাকা বাসী" ভাইয়েরা ! তোমরা একটু বুদ্ধি-বিবেক খাটাও। ইংরেজরা কি এমন ব্যক্তিকে নিজেদের সমর্থনে খাড়া করতে পারে, যে তাদের খোদাকে মেরে ফেলে, তাদের প্রিয় ধর্মকে সমূলে উৎপাটিত করে? এইরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ কথা-বার্তা কেবল তোমাদের মত মোল্লাদের মুখেই শোভা পায়।

জিহাদ কেবল উক্ত দুই প্রকারেই নয় বরং এক প্রকার জিহাদ আরো আছে যাকে কুরআনের ভাষায় জিহাদে কবীর বলা হয়েছে, যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

"ওয়া জাহেদহুম বেহী জিহাদান কাবীরা" (২৫ঃ৫৫) অর্থাৎ "তোমরা কুরআন দ্বারা জিহাদে কবীর কর"। লাঠিয়াল মোল্লা ভাইয়েরা মনে করেন যে, তরবারির জিহাদই একমাত্র জিহাদ, অথচ তরবারির জিহাদ শর্ত সাপেক্ষ বিষয়। কেবল শত্রুর তরবারি দ্বারা আক্রমণকে আত্মরক্ষার্থে প্রতিহত করার অনুমতি দান করা হয়েছে যাকে সবচাইতে বড় জিহাদ বলা হয়েছে। আর তরবারির আক্রমণ না হলে এই জিহাদ বৈধই নহে। কুরআন দ্বারা জিহাদে কবীর হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব আলায়হেসসালাম ভরপুরভাবে করেছেন এবং এই জিহাদে করীর যাতে কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকে তার জন্য হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) তাঁর জামাতের অন্তরে আর্থিক কুরবানীর রূহ সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে তারা কোটি কোটি টাকা খলীফার সামনে পেশ করে যাচ্ছে এবং সেই টাকা দিয়ে প্রায় ১০০ টি ভাষায় সম্পূর্ণ কুরআনের অনুবাদ করে বিশ্বের সকল জাতি ও সকল দেশে কুরআনের আলো পৌছানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। পাঁচটি উপগ্রহের সাহায্যে MTA এর মাধ্যমে অহোরাত্র সারা বিশ্বে কেবল আহমদীয়া মুসলিম জমাআতই কুরআন প্রচার করছে এবং জিহাদে কবীরের দায়িত্ব পালন করছে। হে তথাকথিত আমরা ঢাকাবাসী মোল্লাগণ! তোমরা কেবল জিহাদ জিহাদ কর, প্রকৃতপক্ষে তোমরা কোন জিহাদই করছো না। জিহাদে আসগরও নয় জিহাদে কবীরও নয় আর জিহাদে আকবরও নয়। কারণ জিহাদের জন্য জরুরী শর্ত আছে যে, একজন খলীফা বা ইমাম বিদ্যমান থাকতে হবে; নবী করীম সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

"আল্ ইমামো জুন্নাতুন ইউকাতালো মিঁওয়ারায়েহী অর্থাৎ ইমাম ঢালস্বরূপ। জিহাদ তার পিছনে থেকেই করতে হয়। ইহা সুস্পষ্ট যে, তোমাদের মধ্যে কোন খলীফা নেই, ইমাম নেই। ইহা দ্বারা এই বিষয়টিও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তোমরা জিহাদে আকবরও করছো না, আত্মশুদ্ধির গুরুদায়িত্ব তোমরা পালন করছো না। যদি তাই তোমাদের মধ্যে ঈমান এবং আমলে সালেহ থাকতো তা হলে অবশ্য অবশ্যই বহির্জগতে তোমাদের মধ্যে একজন খলীফা থাকতো। কুরআন অনুযায়ী সঠিক ঈমান ও আমলে সালের অকাট্য মাপকাঠি বা কষ্টি পাথর হলো খেলাফত বিদ্যমান থাকা। সূরা নূরের প্রসিদ্ধ আয়াত আয়াতে ইস্তেখলাফ বের করে দেখ এবং চিন্তা কর আল্লাহ পরিষ্কারভাবে ইরশাদ করেছেন যে, যত দিন তোমাদের মধ্যে ঈমান এবং আমলে সালেহ থাকবে আল্লাহ্তাআলা অবশ্য-অবশ্যই তোমাদিগকে খেলাফত দান করবে। কারণ আয়াতে "লায়াস্তাখ্লেকফন্নাহুম ফিল আরযে" লামে তাকীদ ও নূনে সাকীলা ব্যবহার করে আল্লাহ্তাআলা পূর্ণ ও দৃঢ় অঙ্গীকার করছেন যে, ঈমান ও নেক আমল –অবশ্যই অবশ্যই তোমাদিগকে এই রূপেই খেলাফতের নেয়ামত দান করবেন যেরূপে পূববর্তী জাতিদিগকে দান করেছিলেন। এইরূপ খেলাফতের দ্বারা দীনে ইসলামকে সুদৃঢ় করবেন এবং খেলাফতের অধীনস্থ লোকদের ভয়-ভীতি শান্তিতে পরিণত করবেন, খালিস লিল্লাহী ইবাদতের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। শিরকের মূল উৎপাটন করবেন, খালিস তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত করবেন; আয়াতের শেষাংশে বলেছেন যে, যারা এইরূপ খেলাফতকে অস্বীকার করবে বা যাদের মধ্যে খেলাফত বিদ্যমান থাকবে না তারা ফাসেক-দুষ্কর্মকারী হবে।

মিথ্যা নবুওয়তের দাবীদারকে চরম শাস্তি দেয়ার বিষয়টি খোদাতাআলা নিজ হাতে রেখেছেন। কোন মানুষের হাতে দেন নাই। সূরা আল্ হাক্কার শেষ আয়াতগুলি ভাল করে পড়ুন, ওখানে এই কথা বলা হয়েছে। মুসায়লামা কায্যাব মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করেছিল নবী করীম সল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়; তাই হুযূর (সঃ) তাকে ডেকে নিজে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সে বলেছিল যে, যদি এই চুক্তি হয় যে, মুহাম্মদের মৃত্যুর পর ক্ষমতা আমাকে দেয়া হবে, তাহলে আমি তার আনুগত্য করবো। নবী করীম (সঃ)-এর হাতে খেজুর বৃক্ষের পাতার ছড়ি ছিল, হুযূর (সঃ) তাকে বললেন, যদি তুমি আমার নিকট এই ছড়িটাও চাও তবু আমি তোমাকে ইহা দিব না। তোমার ফয়সালা এখন খোদা করবেন এবং অবশ্যই তোমাকে ধ্বংস করবেন। এর পর সে চলে গেল। নবী করীম (সঃ) সাহাবা (রাঃ) দিগকে একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে বল্লেন যে, আমার মৃত্যুর পর "য়াখরোজানে বা'দী" দুই জন মিথ্যাবাদী লোক বিদ্রোহ করবে, তাদের মধ্যে একজন "আন্সী" অন্যজন "মুসায়লামা কায্যাব" (বুখারী কিতাবুল মানাকেব)। সুতরাং মিথ্যা নবুওয়তের দাবীদারকে নবী করীম (সঃ) শাস্তি দেন নাই। হুযূর (সঃ)-এর মৃত্যুর পর যখন সে বিদ্রোহ করলো তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) তার বিদ্রোহ দমন করার জন্য হযরত খালিদ বিন ওলীদকে নিয়োজিত করলেন। তখন সে মারা যায়। সার কথা, মুসায়লামা কায্যাবকে মিথ্যা নবুওয়তের দাবীর কারণে অদৌ শাস্তি দেন নাই; কারণ এইরূপ দাবীদারের শাস্তি আল্লাহ্র হাতে রয়েছে। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-ই তাকে তার বিদ্রোহের কারণে শাস্তি দিয়েছেন। যেরূপে নবী করীম (সঃ)-এর রোইয়ার মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল।

আমাদের শেষ কথা আল্লাহ্তাআলা সকলকে সুমতি দিন এবং সত্য বুঝার সৌভাগ্য দান করুন।

আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক
সদর মুরব্বী

সংবাদ

ওয়াকফে জাদীদ নওমোবাইনগণের ওয়াদার তালিকা প্রণয়ন ও কেন্দ্রে প্রেরণ প্রসঙ্গে ঃ

আপনি অবগত আছেন যে, গত ৩১ জুলাই লন্ডনস্থ ইসলামাবাদ (টিলফোর্ড) শহরে ৩৩ তম ইউ, কে, এর সালানা জলসার শেষ দিবসে (২রা আগষ্ট ৯৮) আন্তর্জাতিক বয়াত গ্রহণ অনুষ্ঠানে সারা বিশ্বে ৫০ লক্ষাধিক খোদা-প্রেমিক আল্লাহ্‌র অশেষ ফযলে হুযূর (আইঃ)-এর মোবারক হস্তে বরাত গ্রহণ করে পবিত্র সেলসেলায় দাখিল হওয়ার সুযোগ লাভ করেন, আলহামদুলিল্লাহ্। তন্মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ থেকেও শহস্রাধিক ভ্রাতা চলতি বৎসর বয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

এই সকল নূতন বয়াত গ্রহণকারী (নওমোবাইন) ও বিগত ৪/৫ বৎসরে বয়াতকারী সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট থেকে অনতিবিলম্বে ওয়াকফে জাদীদের চান্দার ওয়াদা গ্রহণ করে কেন্দ্রে প্রেরণের জন্য সকল জামাতের আমীর/ প্রেসিডেন্টকে বিনীত অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ইহা অবশ্যই আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে আদায় করতে হবে। এই মর্মে গত জানুয়ারি মাসে পাক্ষিক আহমদীতে বিজ্ঞপ্তি ও সার্কুলারের মাধ্যমেও আপনাদিগকে অবহিত করা হয়েছিল। সেই মোতাবেক বহু স্থানীয় জামাত থেকে আশানুরূপ সারা পাওয়া যায় নি। বিষয়টি অতীব জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হুযূর (আইঃ) গত ২রা জানুয়ারি, ১৯৯৮ ইং তারিখে লন্ডস্থ মসজিদে জুমুআর খুতবার মাধ্যমে এই স্কীমের ঘোষণা দেন ও প্রত্যেক নওমোবাইন ভ্রাতা-ভগ্নীকে এই মোবারক তাহরীকে শামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। **এই খাতে প্রত্যেক সদস্যকে নির্ধারিত হারে বৎসরে নূন্যতম ৭০.০০ টাকা ওয়াদা করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়।** অপারগতার কারণে যদি কোন সদস্য এর চেয়ে কমও ওয়াদা করতে চান তাকেও যেন এর মধ্যে শামিল করানো হয়। *শফিক আহমদ*
সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ নওমোবাইন

❑ ঘাটুরা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে ৬/৯/৯৮ ইং তারিখে বন্যা দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ-বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

❑ মজলিসে আনসারুল্লাহ্, খুলনার উদ্যোগে কেন্দ্রের অনুমোদন ক্রমে গত ৪/৯/৯৮ ইং তারিখে সারাদিন ব্যাপী ৬ষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। আহমদী বার্তা

সন্তান লাভ

❑ গত ২৭-৮-৯৮ রোজ বৃহস্পতিবার বেলা ৩.৩০মি: আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে একটি কন্যা সন্তান দান করেছেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্ নবজাত শিশুর ও আমার স্ত্রীর সুস্বাস্থ্যের জন্য জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নীদের কাছে দোয়ার আবেদন করছি- মোহাম্মদ আলম শেখ, সুন্দরবন।

শুভবিবাহ

নারায়ণগঞ্জ জামাতের মরহুম মোসলেহউদ্দিন চৌধুরী (মোগলমিয়া) সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র জনাব চৌধুরী দেলোয়ার হোসেন সাহেবের সহিত ক্রোড়া জামাতের জনাব আব্দুল হাদী সাহেবের তৃতীয়া কন্যা মোসাম্মৎ আঞ্জুমান আরা বেগম এর শুভ বিবাহ গত ১১-৯-৯৮ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার চল্লিশ হাজার ১ টাকা দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান মৌলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী এবং দোয়া পড়ান আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল আমীর মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব। এই বিবাহ যেন বাবরকত হয় সেজন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন রাখছি- সৈয়দ আব্দুল কবীর

শোক সংবাদ

গত ১১/০৯/৯৮ ইং তারিখ শুক্রবার দিনগত রাত্রে ১টা ২০মিনিটে আমার মাতা নাটোর জামাতের প্রবীণ আহমদী করম আলী আফ্রাদ সাহেবের স্ত্রী নূরজাহান বেগম (৬০) পিত্তথলির ক্যান্সারে আমার নিজ বাড়ী আহমদনগরে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

মৃত্যু কালে তিনি স্বামী, ১ ছেলে ও ৫ মেয়ে সহ অনেক নাতী-নাতনী রেখে গেছেন। তাঁর জানাযা আহমদনগর জামাতে শনিবার ১২/০৯/৯৮ তারিখ বাদ যোহর পড়ানো হয়। আল্লাহ্‌তাআলা যেন তাঁর রূহের মাগফেরাত ও পরিবারবর্গকে ঈমান ও সব্‌রে জামীল দান করেন সেজন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করছি- মোহাম্মদ মোবারক আলী আফ্রাদ, আহমদনগর।

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ৩১ কোটি টাকা সাহায্যের আবেদন

❑ ১২ সেপ্টেম্বর '৯৮- দেশের বন্যাদুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি ৩১ কোটি ২৩ লাখ ২৫ হাজার টাকার অতিরিক্ত সাহায্য প্রদানের জন্য সারা বিশ্বের রেডক্রিসেন্ট ও রেডক্রস সোসাইটিসমূহের কাছে আবেদন করেছে।

ইতোমধ্যে ৮ কোটি ৭১ লাখ ৪১ হাজার টাকা পাওয়া গেছে। আবেদনকৃত বর্ধিত সাহায্য এসে গেলে দেশের ৩২ লাখ মানুষ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির রিলিফ কর্মসূচীর আওতায় এসে যাবে বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে।

খুলনায় প্রথম বেসরকারী বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন

❑ ১৩ সেপ্টেম্বর '৯৮- গতকাল শনিবার খুলনার গোয়াল পাড়ায় দেশের প্রথম বার্জ মাউন্টেন বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

দেশের প্রথম বেসরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র যৌথ উদ্যোগে খুলনা পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত। ১১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি ১০ মাসের মধ্যে স্থাপিত হয়।

প্রায় ৫০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইউনিট প্রতি ২.২৪ টাকা দামে কিনে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড তা গ্রাহকদের কাছে বিতরণ করবে।

চিংড়ি চাষ রফতানী প্রক্রিয়া দেখতে ইইউ প্রতিনিধি দল আসবে

❑ ১৩ সেপ্টেম্বর '৯৮-বাংলাদেশের চিংড়ি চাষ, প্রসেসিং ও রফতানী প্রক্রিয়া দেখতে একটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর প্রতিনিধি দল শীঘ্রই ঢাকা আসবে। এই প্রতিনিধি দলের প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ চিংড়ি রফতানীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

দেশের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি

❑ ১৩ সেপ্টেম্বর '৯৮-অবশেষে দু'মাস ধরে শতাব্দীর ভয়াবহ মহাপ্লাবন পরিস্থিতি উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই ভয়াবহ বন্যায় ১২০০ জনের প্রাণহানি হয়েছে। ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে ৫ লাখ মানুষ। প্রায় সাড়ে ৮ লাখ পরিবার গৃহহীন হয়েছে। বন্যায় ২৮ লাখ টন খাদ্য শস্য বিনষ্ট ও ঘাটতি ৫০ লাখ টন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৪ লাখ হেক্টর জমির ফসল। সরকারী, বেসরকারী ও বিদেশী ত্রাণকার্য আসা অব্যাহত রয়েছে।

অস্বচ্ছল বিচার প্রার্থীদের আইনী সহায়তা দিতে আইন হচ্ছে

❑ ১৩ সেপ্টেম্বর '৯৮–আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ও সহায়-সম্বলহীন বিচারপ্রার্থীদেরকে আইনগত সহায়তা দেওয়ার জন্য একটি নতুন আইন প্রণয়ন করছে সরকার। "আইনগত সহায়তা আইন"–৯৮ নামের প্রস্তাবিত এই আইনটির খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদনের জন্য আগামীকাল মন্ত্রীসভার বৈঠকে পেশ করা হচ্ছে।

তৈরী পোশাক রপ্তানী অব্যাহত রাখতে উদ্যোগ

❑ ১৪ সেপ্টেম্বর '৯৮–প্রলম্বিত বন্যায় দেশের সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ রপ্তানি পণ্য পরিবহনের সুবিধার্থে কাঁচপুর-দাউদকান্দি ফেরি সার্ভিস চালু করেছে। রেলওয়ে কন্টেইনার পরিবহন অব্যাহত রাখার প্রাণান্ত ও রপ্তানিকারক সংগঠন বিজিএমইএ কার্গো বিমান ভাড়া করেছে।

ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলন বাতিল ঘোষণা

❑ ১৪ সেপ্টেম্বর '৯৮–অবশেষে ডি-৮ সম্মেলন বাতিল করা হয়েছে। এতে সরকারের প্রায় ১৫ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। অপরদিকে ২০০১ সালে ঢাকায় 'নাম' সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ঢাকা মহানগরীর চারপাশে বাঁধ নির্মাণ করা হবে

❑ ১৬ সেপ্টেম্বর '৯৮–ঢাকা মহানগরীকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা এবং সম্প্রসারণশীল যানবাহন ও পরিবহন ব্যবস্থার উনয়নের লক্ষ্যে নগরীর চারদিকে নৌপথের ব্যবস্থা রেখে ৫০ কি. মি. দীর্ঘ একটি বাঁধ ও রেল সুবিধাসহ একটি রিং রোড নির্মাণ করা হবে।

বন্যায় শিল্পের ক্ষতি ২ হাজার কোটি টাকা

❑ ১৮ সেপ্টেম্বর' ৯৮– বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রির (বিসিআই) নিজস্ব হিসাব অনুযায়ী এবারের বন্যায় দেশের শিল্পখাতের ক্ষতি হবে ২ হাজার কোটি টাকা। বিসিআই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণে সহজ শর্তে ঋণ দেয়ার জন্য দাতা সংস্থাগুলোর কাছে আবেদন জানিয়েছে।

বন্যায় পরিবহন সেক্টরে ক্ষতি ২ শ' কোটি টাকা

❑ ১৮ সেপ্টেম্বর '৯৮– বন্যায় সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে প্রায় ৭০ ভাগ পরিবহন বন্ধ রয়েছে। ফলে প্রতিদিন পরিবহন সেক্টরে ক্ষতি হচ্ছে প্রায় ৬ কোটি ১৮ লাখ টাকা। গত ২১ আগস্ট থেকে এই ক্ষতি গাড়ী মালিকদের উপর চাপাচ্ছে। দীর্ঘায়িত এই বন্যায় পরিবহন সেক্টরে ক্ষতির পরিমাণ ২ শ' কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে পরিবহন মালিকরা ধারণা করছেন।

সড়ক পরিবহন সমিতির হিসেব মতে সারাদেশে মোট বাস, মিনিবাস ও ট্রাকের সংখ্যা ৬৮ হাজার। বাস ও কোচ ১৫ হাজার ৩ শ' ৫৭, মিনিবাস ১৩ হাজার ৪ শ' এবং ট্রাক ৩৯ হাজার ১ শ ৪৮টি। উল্লেখ্য যে, বন্যার কারণে এর মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ গাড়ী রাস্তায় চলছে।

লালবাগ থানা : হত্যা মামলার ২ আসামীর পলায়ন

❑ ১৮ সেপ্টেম্বর '৯৮–গত বুধবার (১৬/৯/৯৮) ভোর রাতে লালবাগ থানা হাজত থেকে হত্যা ও অস্ত্র মামলার ২ আসামী পালিয়ে গেছে।

পদ্মা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ

❑ ১৮ সেপ্টেম্বর '৯৮–দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকার সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-খুলনা মহাসড়কে পদ্মা নদীর উপর সেতু নির্মাণের জন্য ৩ হাজার ৬৪৩ কোটি ৫০ লাখ টাকার প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। ৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এবং ১৮.১০ মিটার প্রস্থ এই সেতুটি নির্মিত হলে এটিই হবে দেশের সবচেয়ে দীর্ঘতম সেতু। ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে নির্মাণ কাজ শুরু করে ২০০৪ সালের জুন মাসে শেষ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত টাকার ২,৮৯৩ কোটি ৫০ লাখ বৈদেশিক সূত্র ও ৭৫০ কোটি টাকা স্থানীয় সূত্র থেকে যোগানদানের কথা বলা হয়েছে।

নোয়াখালিতে বন্যার অবনতি

❑ ২১ সেপ্টেম্বর '৯৮–অবিরাম বর্ষণ ও উজানে নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় নোয়াখালী ও কুষ্টিয়া জেলায় আবার বন্যার অবনতি ঘটেছে।

বিশ্বের টুকরো খবর

শ্রীলংকায় বোমা বিস্ফোরণে জাফনার মেয়রসহ ১৯ জন নিহত

❑ ১২ সেপ্টেম্বর '৯৮–শ্রীলংকা তামিল অধ্যুষিত জাফনা শহরে গতকাল শুক্রবার একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে মেয়র এবং সেনাবাহিনী ও পুলিশের ৩ জন পদস্থ কর্মকর্তাসহ ১৯ জন নিহত হয়েছেন।

মোহাম্মদ আলী জাতিসংঘের শান্তিদূত নিয়োগ

❑ ১৬ সেপ্টেম্বর '৯৮– তিনবার বিশ্ব হ্যাভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়ন মোহাম্মদ আলীকে জাতিসংঘ বিশ্বসংস্থার শান্তিদূত নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেছে।

জাতিসংঘের মুখপাত্র ফ্রেড একার্ড বলেন, মহাসচিব কফি আনান মানব কল্যাণের একজন একনিষ্ঠ কর্মী আলীকে শান্তিদূত করার ঘোষণা করেছেন। মুখপাত্র জানান, মোহাম্মদ আলী জাতিসংঘে সেবা প্রদানে রাজি হয়েছেন।

আফগান সীমান্তে ইরানের ৯ ডিভিশন সৈন্য

❑ ১৮ সেপ্টেম্বর '৯৮–ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্যে অব্যাহত উত্তেজনার প্রেক্ষিতে ইরান আফগান সীমান্তে ট্যাংক ও কামানসহ ৯ ডিভিশন সৈন্য প্রেরণ করেছে। অপরদিকে তালেবান শাসক মোল্লা ওমর ইরানের কোন চাপের মুখে তার দেশ নতি স্বীকার করবে না বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, ইরানের সৈন্যরা যদি আফগানিস্তান আক্রমণ করে তাহলে এমন লড়াই শুরু হবে, যা কয়েক দশক ধরে চলবে।

ইরান-আফগান সংঘাতে পাকিস্তান নিরপেক্ষ থাকবে

❑ ১৯ সেপ্টেম্বর '৯৮–চলমান ইরান-আফগান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে ইরান আফগানিস্তান হামলা করলেও পাকিস্তান নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে। তেহরানে ইরানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল খারাজীর সাথে আলোচনার পর বক্তৃতাকালে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সারতাজ আযীয একথা বলেন।

আলজেরিয়ায় বোমা বিস্ফোরণে ২২ জন নিহত

❑ ২০ সেপ্টেম্বর '৯৮–আলজেরিয়ার তিয়ারেট নগরীর একটি বাজারে একটি বোমা বিস্ফোরণে ২২ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়েছে।

মালয়েশিয়ার বরখাস্তকৃত অর্থমন্ত্রী গ্রেফতার

❑ ২১ সেপ্টেম্বর '৯৮–মালয়েশিয়ার বরখাস্তকৃত অর্থমন্ত্রী আনওয়ার ইব্রাহীমকে সে দেশের পুলিশ গতকাল রাতে তার শহরতলীর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করেছে।

প্রধানমন্ত্রী মহাথির মোহাম্মদের পদত্যাগের দাবীতে রাজধানীতে এক বিক্ষোভের নেতৃত্বদানের কয়েকঘন্টা পর তাকে গ্রেফতার করা হয়।

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43,NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

TEL : 884724, 872220, 884076,Email-mhk@bdmail.net FAX: 880-2-883552

STAR

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."

FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE

FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION

36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG

TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

AHMED TRADE INTERNATIONAL

Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.

Dyer : we have a power dyeing house of our own. **with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.**

Office :
79, Hoseni Dalan Road
Dhaka-1211

Factory
36/D, Kakrail (1st Floor),
Dhaka-1000

Phone :
Off : 239013
Res : 804944

Mobile 017527771
Fax : 880-2-805350

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRDUCER OF QALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

Muslim TV AHMADIYYA INTERNATIONAL

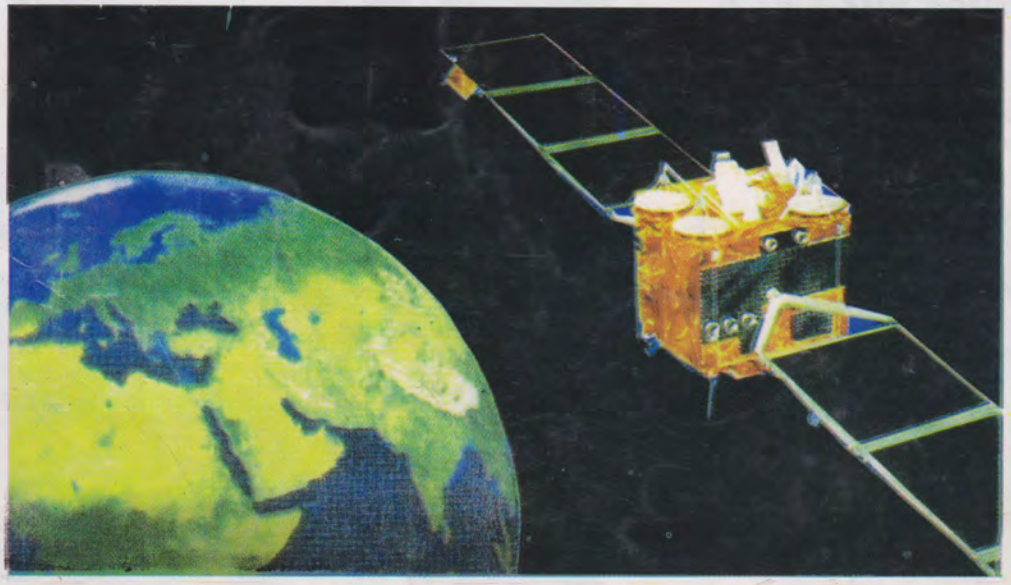

MTA AUDIO CHANNELS

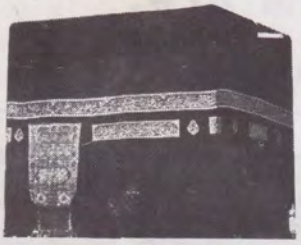

* Main	: 6.50 MHz	* French	: 7.56 MHz
* English	: 7.02 MHz	* German	: 7.74 MHz
* Arabic	: 7.20 MHz	* Indonesian	: 7.92 MHz
* Bangla	: 7.38 MHz	* Turkee	: 8.10 MHz

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

এমটিএ অহোরাত্র

দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

MTA-এর নতুন কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক মঙ্গল ও বুধবার কুরআন ক্লাস
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বুধবার বাংলা সার্ভিসে পুরাতন খুতবা প্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্ন-উত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- এমটিএ-এর দর্শক-শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ প্রোগ্রামগুলো দেখতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর খুৎবাহ শুনুন।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইষ্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মে: হা:।

আপনার বাড়ীতে এমটিএ MTA -এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272